রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

বৃহত্তর সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী তৃতীয় রাজ্য কাউন্সিল সভা গত ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর ২০১৪ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন সভাপতি অশোক পাত্র, সহ-সভাপতি চুনীলাল মুখার্জী, চন্দন ঘোষ

মনোজ কান্তি গুহ

এবং কৃষ্ণা বসুকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে উত্থাপিত শোক প্রস্তাবে এই সময়কালে কো-অর্ডিনেশন কমিটি, তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমিতিগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ-আন্দোলনের প্রয়াত নেতৃবর্গ এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিহত মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কাউন্সিলে প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। প্রস্তাবনায় ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় রানী রাসমণি রোড এবং শিলিগুড়িতে বাঘাযতীন পার্কের ঐতিহাসিক কর্মচারী সমাবেশসহ বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা, দ্বিতীয় রাজ্য কাউন্সিল পরবর্তী জুলাই ২০১৪ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৪ সমিতিসমূহ, সংগঠনের জেলা ও কেন্দ্রীয় সম্পাদমণ্ডলীর পক্ষে ৩টি পর্যায়ে জেলার ব্লকস্তর পর্যন্ত এবং কলকাতার ৭টি অঞ্চল কমিটিতে সফরসূচী, পরবর্তীতে সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সাথে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভার মধ্য দিয়ে উঠে আসা সাংগঠনিক বিষয়সমূহ এবং আগামী কর্মসূচী ও করণীয় বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে ১৮টি জেলা, কলকাতার ৭টি অঞ্চল, অন্তর্ভুক্ত

অসিত কুমার ভট্টাচার্য

ও সহযোগী সমিতিগুলির নেতৃবৃন্দের সামনে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়।

বর্তমান রাজ্য সরকারের সাড়ে তিন বছরের সময়কালে সরকারী কর্মচারীরা দারুণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন। মহার্ঘভাতা বকেয়া ৪৯ শতাংশ। এর সঙ্গে রয়েছে হয়রানিমূলক বদলী সহ প্রশাসনিক আক্রমণ, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবি। বিগত কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মচারীর আর্থিক দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে ১০ই সেপ্টেম্বরের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। একই সঙ্গে সাংগঠনিক অবস্থা পর্যালোচনার প্রশ্নে সফর সূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। এই দুই কর্মসূচীকে সফল করার জন্য বিভিন্ন সমিতি, ব্লক স্তর পর্যন্ত সফর করেছেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ ১৪৩টি ব্লকে সফর করেছেন এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে। এই সফরে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের সাথে কর্মী-কর্মচারীর সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে এবং সর্বত্র উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

সর্বস্তরের কর্মী নেতৃত্বের সর্বাধিক উদ্যোগের মধ্য দিয়ে রাজ্যের দু'প্রান্তে ব্যাপক কর্মচারী সমাবেশ এই বার্তাই দিয়েছে বকেয়া দাবি আদায়ের প্রশ্নে 'পথ'ই—একমাত্র পথ। এবারের সমাবেশে কর্মচারীরা নিজেদের পকেটের অর্থ ব্যয় করে এসেছেন, অপরদিকে সমাবেশের স্বেচ্ছাবাহিনীতে যারা যুক্ত ছিলেন তারা সকলেই নেতৃত্ব—কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদমণ্ডলীর সদস্য বা সমিতির সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদকগণ। এছাড়াও বিগত কর্মসূচীর ক্ষেত্রে ১৪ জুলাই-১২ই

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

যৌথ আন্দোলনের নবদিগন্ত উন্মোচিত

বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা ও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের দাবিতে

লাগাতার অবস্থানের ঘোষণা

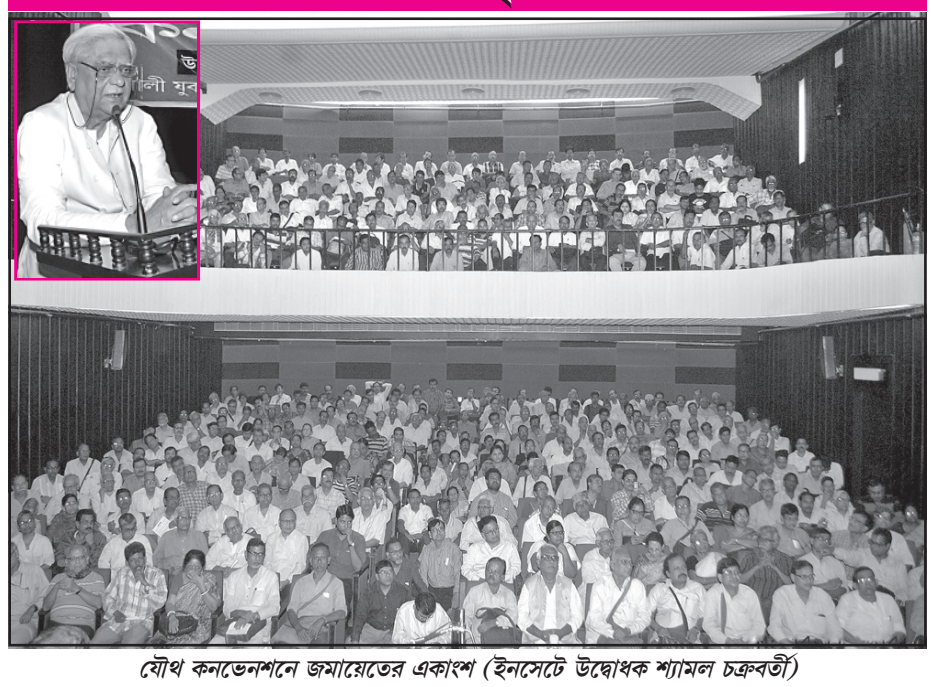

যৌথ কনভেনশনে জমায়েতের একাংশ (ইনসেটে উদ্বোধক শ্যামল চক্রবর্তী)

রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বোর্ড-কর্পোরেশন সহ বিধিবদ্ধ সংস্থার শ্রমিক কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আহ্বানে বিগত ১৪ নভেম্বর '১৪ মৌলালী যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল যৌথ কনভেনশন। স্বল্প পরিসরের সভাগৃহ ছাপিয়ে শ্রমিক কর্মচারী-শিক্ষকদের জমায়েত যুবকেন্দ্রের সামনের রাস্তার উপর গিয়ে পৌঁছায়। অনমনীয় প্রত্যয় নিয়ে কনভেনশনের শুরু থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত এতটুকুও নড়েননি কেউ।

অতীব তাৎপর্যপূর্ণ এই কনভেনশন পরিচালনা করেন অশোক পাত্র (রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি), রতন ভট্টাচার্য (কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন), বিজলি কান্তি মিত্র (অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কমেনস ফেডারেশন), অশোক অধিকারী (নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি), শ্রাবণী সেনগুপ্ত (জয়েন্ট কাউন্সিল অফ অ্যাকশন অফ ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ), গৌতম মজুমদার (কে এম ডি-এ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন), রামপ্রসাদ সেনগুপ্ত (ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন), বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (অল বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন), মৃণাল দাস (পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন) এবং নিতাই চন্দ্র মান্না (কে এম ডি এ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন)-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। কনভেনশন উদ্বোধন করেন সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন যে, তাঁর পাঁচ দশকের ট্রেড ইউনিয়ন জীবনের অভিজ্ঞতায় এই ধরনের যৌথ মঞ্চ কখনও দেখেন নি। সময়ের চাহিদাই এই ধরনের বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

প্রকাশ্য রাজপথের গণকনভেনশনেই শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের শপথ

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন সমূহ ও ১২ই জুলাই কমিটির যৌথ উদ্যোগে ১০ নভেম্বর ২০১৪ কলকাতায় ওয়াই চ্যানেলে কর্মী-নেতৃত্বের বৃহৎ জমায়েতের মধ্য দিয়ে গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত

দীপক দাশগুপ্ত

হয়। গত ১৫ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শ্রমিক কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে রাজ্যের সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার অনুসৃত জনবিরোধী আর্থিক ও শ্রমনীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গড়ে ওঠা সংগ্রামে সামিল হওয়ার আহ্বান জানায় এই কনভেনশন। একই সাথে ৫ ডিসেম্বর দেশব্যাপী 'প্রতিবাদ দিবস' পালনের জন্য শ্রমজীবী মানুষের কাছে আহ্বান জানান উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। কনভেনশন গভীর উদ্বেগের সাথে এই রাজ্যে আইনের শাসনের অনুপস্থিতিতে যে ব্যাপক দুর্নীতি ও অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার দ্রুত অবসান এবং দুর্নীতি ও দুষ্কর্মের সাথে যুক্ত সকল অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দাবি করে।

এই কনভেনশনে প্রস্তাব পেশ করেন সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের ফলে দেশে শ্রমিক কর্মচারী খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে যে শ্রম আইনগুলি প্রণীত

তপন দাশগুপ্ত

হয়েছিল কেন্দ্রেও কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন সরকার সেই শ্রম আইনগুলির নেতিবাচক

(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন / কমিটি গঠন
চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সহ
৬ দফা জরুরী দাবি আদায়ে

১১ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে

লাগাতার গণ-অবস্থান

স্থান : ওয়াই চ্যানেল (ধর্মতলা) কলকাতা

১৫ ডিসেম্বর ২০১৪
সময় : সন্ধ্যা : ৫.৩০ মিনিট
শ্রমিক-কর্মচারী
শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের

সুবিশাল সমাবেশ

প্রধান বক্তা : মাননীয় সূর্যকান্ত মিশ্র
রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা

দিকে দিকে প্রস্তুতি গড়ে তুলুন

॥ উদ্যোক্তা সংগঠনসমূহ ॥
● রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ● নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ● নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ● পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন ● কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ● অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কম্যানস ফেডারেশন ● সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কলকাতা ট্রাম ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি ● পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন ● জয়েন্ট কাউন্সিল অব অ্যাকশন অব ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ● কে এম ডব্লু এন্ড এস এ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কে এম ডি এ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন।

১১ ডিসেম্বর ২০১৪
জেলা সদরে
বিক্ষোভ জমায়েত
(ছুটির পর)

আহ্বায়ক সংগঠনসমূহ

● রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ● নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ● নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ● পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ ওয়ার্কমেনস্ ইউনিয়ন ● কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ● অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কম্যানস্ ফেডারেশন ● সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কলকাতা ট্রাম ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি ● পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন ● জয়েন্ট কাউন্সিল অব এ্যাকশন অব ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ● কে এম ডব্লু অ্যান্ড এস এ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কে এম ডি এ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন।

গণ অবস্থানের ৬ দফা দাবি

● রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বোর্ড-কর্পোরেশন সহ বিধিবদ্ধ সংস্থার সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে।

● রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন/কমিটি গঠন করতে হবে।

● শ্রম আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী বাতিল সহ প্রশাসনিক দমন-পীড়ন বন্ধ করতে হবে। হয়রানিমূলক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বদলি করা চলবে না। ধর্মঘটের অধিকারসহ ট্রেড ইউনিয়ন করার অর্জিত অধিকার রক্ষা করতে হবে।

● প্রশাসনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, বিধিবদ্ধ সংস্থাসহ সর্বস্তরে স্থায়ী শূন্যপদগুলি পূরণ করতে হবে। অনিয়মিত এবং চুক্তিতে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করার সুযোগসহ নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। শিক্ষার অধিকার আইন বা অন্য কোন অজুহাতে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে কর্মচ্যুত করা যাবে না।

সরকারী পরিষেবায় নিযুক্ত সকল শ্রমিক-কর্মচারীদের পেনশন সুনিশ্চিত করতে হবে।

নতুন পেনশন স্কীম বাতিল করতে হবে।

মৃত শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর পরিবারের পোষ্যের

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার

নভেম্বর ২০১৪
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৩তম বর্ষ □ সপ্তম সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

দুরারোগ্য কর্কট রোগের কবলে পড়বে নাতো আমাদের রাজ্য?

অসুখটা কি তা ধরতে পারলেই আপনা-আপনি সেরে যায় না। সারিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হয় সঠিক ওষুধ অথবা শল্যচিকিৎসা। 'ডায়াগনোসিস্' যদি সাফল্যের প্রথম ধাপ হয়, তাহলে দ্বিতীয় ধাপ অবশ্যই মেডিসিন অথবা সার্জারির সফল প্রয়োগ। পরস্পর সম্পর্কিত এই দুটি ধাপের কোন একটিতে ত্রুটি ঘটলেই, মুমূর্ষ রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হাতছানি দেয়। মানুষ নামক প্রাণীটির শারীরিক বা মানসিক রোগের প্রতিকারের প্রশ্নে যেমন একথা খাটে, তেমনই কোন দেশ বা রাজ্য যদি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অসুখে আক্রান্ত হয়, সেক্ষেত্রেও উপযুক্ত চিকিৎসার পথ খুঁজে না পেলে সমূহ বিপদ ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বর্তমানে ঠিক এই আশঙ্কাই যেন দেখা দিয়েছে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রেও।

পশ্চিমবাংলা যে আজ গভীর অসুখে আক্রান্ত সম্ভবত এই নিয়ে কেউই কোনো দ্বিমত পোষণ করবেন না। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সমস্ত দিক থেকেই এর উপসর্গ প্রায় প্রতিদিনই প্রকাশ পাচ্ছে এবং সমগ্র পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটছে দ্রুত। সমাজ জীবনে যখন কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে তখন উপযোগী ওষুধ প্রয়োগ বা সময়মতন শল্য চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় জনসাধারণকেই। কিন্তু তার আগে রোগ চিহ্নিত করা বা নিরাময়ের পথ বাতলানোর দায় থাকে বিভিন্ন রাজনৈতি দল, গণসংগঠন ও মিডিয়ার ওপর। বলাবাহুল্য, এই ডায়াগনোসিস বা বিশ্লেষণের কাজে এবং পরবর্তী চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদানে মিডিয়া বা গণমাধ্যমই আজ প্রধান ভূমিকা পালন করছে। জনমানসে এর প্রভাব আজ সর্বাধিক। এমনকি রাজনৈতিক দল বা গণসংগঠনের বক্তব্য-প্রচারকে 'মিডিয়ার' কষ্টি পাথরে যাচাই করেই বহুক্ষেত্রে মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। নয়া উদারবাদী অর্থনীতির পর্বে অমিত পরাক্রমশালী মিডিয়ার ওপর মানুষের নির্ভরতাই হয়ে উঠছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান চালিকাশক্তি। এক্ষেত্রে এমনকি নিজস্ব জীবন-জীবিকার অভিজ্ঞতাও বহু ক্ষেত্রে হয়ে পড়ছে গৌণ। মিডিয়ার এই স্বয়ম্ভু ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেই নোয়াম চম্স্কি বলেছিলেন, 'ইট ইস্ ম্যানুফ্যাকচারিং ইওর কনসেন্ট উইদাউট কনসেন্ট।' অর্থাৎ জনসাধারণের অজ্ঞাতসারেই একটা মতামত খাড়া করছে মিডিয়া এবং সেই মতামতই গ্রহণে জনসাধারণকে প্ররোচিত করা হচ্ছে।

পশ্চিমবাংলায় মিডিয়ার এই ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে একটা বিপদও। তাহল সঠিক রোগ নির্ণয়ের পর ভুল দাওয়াই প্রয়োগের বিপদ। যা পশ্চিমবাংলার ভগ্ন স্বাস্থ্যকে সুস্থ করার পরিবর্তে মারণ রোগের সংক্রমণ ত্বরান্বিত করবে। কেন একথা বলা হচ্ছে?

বর্তমান শাসকদলের স্বরূপ মানুষ উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। এমনকি যাঁরা পরিবর্তন হলে ভালই হবে বলে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসও করেছিলেন, তাঁরাও আজ প্রকাশ্যেই হতাশা ব্যক্ত করেছেন। অস্বীকার করার উপায় নেই সম্প্রতিকালে গণমাধ্যমের একটা বড় অংশই এই বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। একটি আদর্শহীন, নীতিহীন ব্যক্তি সর্বস্ব দল যদি ক্ষমতায় বসার সুযোগ পায়, তাহলে যা ঘটার তাই ঘটছে পশ্চিমবাংলায় এবং মিডিয়ার বড় অংশই বস্তুনিষ্ঠভাবে তা তুলে ধরছে। তা সে অর্থনৈতিক সঙ্কট, চিটফাণ্ড কেলেংকরি, সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ বা নারীদের সম্ভ্রমহানি প্রভৃতি অপ্রীতিকর যে কোন ঘটনা ঘটুক না কেন মিডিয়া বড় অংশই যে শুধু তুলে ধরছে তাই নয়, এই সমস্ত ঘটনা ঘটনোর ক্ষেত্রে শাসকদলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকার কথাও তারা সোচ্চারে বলছে। তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করতেও তারা তৎপরতা দেখাচ্ছে। 'মিডিয়া'র এই কৌশলী পরিবর্তিত ভূমিকা ধীরে ধীরে জনমানসে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করছে। এমনকি যাঁরা এতদিন মনে করতেন মিডিয়া সর্বদাই বামবিরোধী ভূমিকা পালনে অভ্যস্ত, তাঁরাও মিডিয়ার এই পরিবর্তিত ভূমিকায় বেশ খুশি। জনমানসে বিশ্বাসের জমিটা পোক্ত হবার পর মিডিয়া 'ডায়াগনোসিস' ছেড়ে এখন সুস্থ হবার ওষুধ সংবলিত প্রেসক্রিপশন লিখতে শুরু করেছে। বিপদটা এখানেই। কারণ শুরু থেকেই ভুল ওষুধ প্রয়োগের তোড়জোড় শুরু হয়েছে এবং তা ভুল করে নয়, রীতিমত পরিকল্পিতভাবে। কি করছে মিডিয়া? ভালভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, মিডিয়া দু'টি লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। প্রথমত, ডায়োড ভালভের ভূমিকা পালন করা। ডায়োড ভালভ যেমন তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখকে বিপরীতমুখী হতে দেয় না, ঠিক তেমনই মিডিয়া সদাসতর্ক যে বর্তমান শাসকদল-বিরোধী বিপুল বিক্ষোভ, যেন জনগণকে পুনরায় বামপন্থীদের দিকে ঠেলে না দেয়। রাজ্যের শাসকদলের সর্বক্ষেত্রে অপদার্থতা, আকণ্ঠ দুর্নীতি, অশালীন কাজ ও অশ্লীল ভাষা সম্পর্কে যতই শ্লেষাত্মক তীব্র সমালোচনা করুক না কেন, কর্পোরেট পুঁজি লালিত মিডিয়া কখনই তার শ্রেণী অবস্থান ভোলে না। বামপন্থার সাথে তাদের মালিকগোষ্ঠী কর্পোরেট তন্ত্রের যে অহি-নকুল সম্পর্ক তা তারা বিলক্ষণ জানে। বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি মানে কর্পোরেট মালিকদের বাড়া ভাতে কিছুটা হলেও ছাই পড়বে। তাই নীতিহীন বর্তমান শাসকদল বিদায় নিলেও বামপন্থীরা যাতে ফিরে আসতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতেও তারা বদ্ধপরিকর। এই কারণে প্রতিটি সংবাদ পরিবেশনার মধ্যে বিগত বামফ্রন্ট আমলের সাথে ভিত্তিহীন তুলনামূলক আলোচনা টেনে বোঝানো হয় এখন যা কিছু খারাপ তা নাকি আগেও ঘটত। তফাৎ শুধু পরিমাণগত, গুণগত নয়। তাইতো দেখা যায় বর্ধমানের খাগড়াগড় কাণ্ডের সাথে নন্দীগ্রামের হাস্যকর তুলনা টানা হয়। কিন্তু এই দুই ঘটনার বিন্দুমাত্র কোনো মিল আছে কী? নন্দীগ্রামকে দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। আইনের শাসন বলে সেখানে কিছু ছিল না, দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজও ছিল বন্ধ। রাজ্য প্রশাসনের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও নন্দীগ্রামকে গোটা রাজ্য থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর নন্দীগ্রামে কোনো জমি অধিগ্রহণ করা হবে না সংক্রান্ত প্রকাশ্য ঘোষণার পরেও অবরোধ ওঠেনি। সরকারী পরিষেবা পৌঁছে দেবার জন্য আগাম জানিয়ে সেখানে যাওয়ার পরেও, সামনে নারী ও শিশুদের রেখে পরিকল্পিতভাবে বাধা দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য সেই প্রতিরোধও অহিংস প্রতিরোধ ছিল না। পুলিশকে কার্যত প্ররোচিত করা হয়েছিল এবং যার পরিণতিতে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। অথচ খাগড়াগড়ে এমন কোনো বিষয়ই ছিল না। সেখানে শাসক দলের স্থানীয় নেতাদের মদতে ঘর ভাড়া নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাশকতার ছক কষছিল একটি নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠনের সদস্যরা ও অস্ত্র তৈরি করছিল। সাধারণ বুদ্ধিতে এই দুটি ঘটনার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া না গেলেও মিডিয়া প্রমাণ করতে ব্যাস্ত অপরাধের দাঁড়িপাল্লায় নাকি নন্দীগ্রাম ও খাগড়াগড়ের ওজন একই। কি উদ্দেশ্যে এই প্রচার করা হচ্ছে তা আগেই বলা হয়েছে।

তাহলে কি হবে? শাসক দলের গা থেকে এত দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে যে কম্বল চাপা দিয়েও আটকে রাখা যাচ্ছে না। আবার বামপন্থীদেরও ক্ষমতায় ফিরতে দেওয়া যাবে না। অতঃকিম? এই শূন্যস্থান পূরণ করবে কে? প্রমোট করা শুরু হল সাম্প্রদায়িক বিজেপি-কে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই রাজ্যে যাদের কার্যত কোনো অস্তিত্বই ছিল না। পশ্চিমবাংলায় এরা পা রাখার জায়গা পেয়েছিল বর্তমান শাসক দলের মদতেই। অথচ আজ যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার চিত্রনাট্য রচনা করে মানুষকে বোঝানো হচ্ছে, বর্তমান শাসক দলের বিকল্প হতে পারে এরাই। মিডিয়া মনে করে এতে করে মানুষকে সহজেই ফাঁদে ফেলা যাবে। কারণ রাজ্যের শাসক হিসেবে বিজেপি-কে মানুষ দেখেনি। ফলে না-দেখা না-পরখ করা বিষয়ের প্রতি সহজাত ঝোঁক থাকেই। তাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে, যাতে মানুষের এই সাম্প্রদায়িক দলটির প্রতি আস্থা তৈরি হয়। অথচ গুজরাটে এই দলটির শাসনকালে সংগঠিত গণহত্যা বা অন্যান্য রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার কথা একবারও বলা হচ্ছে না। বামপন্থীদের আটকাতে মিডিয়া এতটাই মরিয়া যে নবজাগরণের পীঠস্থান এই রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ পুঁততেও তাঁদের আপত্তি নেই। এমনকি সাম্প্রদায়িক দলটির কার্যকারিতা বোঝাতে, কোথাও শাসক দলের সাথে এদের সশস্ত্র সংঘর্ষ হলে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এইভাবেই নাকি নিরাপত্তাহীন মানুষকে তারা রক্ষা করবে। অথচ বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ও বিভিন্ন গণসংগঠনগুলি যে ধারাবাহিক লড়াই-আন্দোলন-ধর্মঘট করছে, তা কার্যত কোন গুরত্বই পাচ্ছে না মিডিয়ার কাছে। গণতন্ত্রে প্রতিরোধের সংজ্ঞাটাকেও তারা পাল্টে দিচ্ছে।

এই পরিকল্পিত ভুল চিকিৎসাকে যদি রোখা না যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে লুম্পেনগোষ্ঠী, সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু মৌলবাদের ত্র্যহস্পর্শ সঙ্গমে পরিণত হবে প্রিয় রাজ্য, বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চারণভূমি পশ্চিমবাংলা। এক অসুখ থেকে রক্ষা পেতে গিয়ে মারক কর্কট রোগের কবলে পড়া, মেনে নেব?□

২৯ নভেম্বর, ২০১৪

কাকেশ্বরের লুকোচুরি

বাল্য বয়সে সঙ্গী-সাথী অথবা ভগ্নি-ভ্রাতার সহিত লুকোচুরি খেলিবার অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতা সকলেরই রহিয়াছে। বিশেষত, সেই যুগে যখন হাঁটিতে শিখিলেই ল্যাপটপ, মোবাইল অথবা ভিডিও গেমসের সংস্থান হইবার কোনো সুযোগ অথবা সম্ভাবনা ছিল না। বাড়ির চাতাল, ছাদ অথবা চিলে কোঠার নিঃসঙ্গ ঘরটিতে লুকোচুরিই ছিল তখন বাল্য-বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু বাল্যকালের এহেন সখ যে বৃদ্ধ বয়সেও চাগাড় দিতে পারে, কতিপয় দিবস পূর্ব পর্যন্ত তাহা ছিল কল্পনার অতীত। অথচ এই কল্পনাতীত বিষয়টিই সম্প্রতি রূঢ় বাস্তবে পরিণত হইতে প্রত্যক্ষ করিলেন পশ্চিমবঙ্গবাসী। এক 'কাক-বিশারদ' শিল্পী তাঁহার আজানুলম্বিত শ্মশ্রু গুটাইয়া গা ঢাকা দিয়াছেন এবং সি বি আই, ই ডি প্রমুখ তদন্তকারী সংস্থা সমূহের সহিত 'লুকোচুরি' খেলিতেছেন। অবশ্য স্রেফ বিনোদনের স্বার্থে তিনি এমন লুকোচুরি খেলিতেছেন তাহা নয়। বিপরীতে অসাধু উপায়ে চৌর্যবৃত্তি করিয়া বিস্তর উপার্জন করিবার পর, গ্রেপ্তার এড়াইতে গা ঢাকা দিয়াছেন।

বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে 'পরিবর্তনপন্থী' বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যমণি ছিলেন এই কাকেশ্বর চিত্রশিল্পী। শুধু তাই নয়, খোদ সর্বাধিনায়িকার একান্ত বিশ্বাসভাজনেও পরিণত হইয়াছিলেন তিনি। তাই সেই সময়ে তাঁহার বাসস্থানটিই ছিল জঙ্গল মহলের মাওবাদীদের সহিত সর্বাধিনায়িকার গোপন বৈঠকের 'অ্যান্টি চেম্বার'। 'হার হাইনেসের' সেবায় এমন ঝুঁকি লইবার বিনিময়ে তিনি পুরস্কৃতও হইয়াছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হইবার পূর্বে রেলমন্ত্রী থাকাকালিন সর্বাধিনায়িকা তাঁহাকে একটি বিশেষ কমিটিতে বিশেষ স্থান দিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ শ্মশ্রুবান শিল্পীটিও দিল্লিগামী দুরন্ত এক্সপ্রেসের কয়েকটি কামরার বহিঃস্থ দেওয়ালে রঙের ছোপ লাগাইয়াছিলেন।

এই রাজ্যে সরকার গঠিত হইবার পর স্বভাবতই লুটিবার নূতন নূতন উৎসমুখ খুলিয়া গিয়াছে। এবং দক্ষতার সহিত সেগুলিকে ব্যবহার করিয়া কাকেশ্বর সহ শাসকগোষ্ঠীর তাবড় তাবড় ব্যক্তিবর্গ বিপুল পুঁজির মালিক হইয়া উঠিয়াছেন। আশা ছিল, লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী পর্বে তাঁহাদের দল কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন হইতে পারিলে, চৌর্যবৃত্তির যাবতীয় প্রকরণগুলিকে ধামাচাপা দেবার সুযোগ ঘটিবে। কিন্তু বাস্তবে সেই আশাপূরণ না হওয়ায়, আতঙ্কে দিন কাটিতেছে শাসক দলের প্রথম সারির রথী-মহারথীগণের। 'ক্রাইম নেভার পেইস্'— এই ইংরাজী প্রবাদ বাক্যটি সম্ভবত তাঁহাদের স্মরণে আসিয়াছে। তাই চৌর্যবৃত্তির পর্দা ফাঁস হইবার আশঙ্কায় অন্তর্ধান করিয়াছেন শ্রীমান কাকেশ্বর। অন্যদিকে খবরে প্রকাশ 'ভয়' নামক ব্যধি এক মন্ত্রীমহোদয়ের মস্তিষ্কে বাসা বাঁধিয়াছে। তাঁহার সর্বক্ষণই আশঙ্কা হইতেছে কেহ তাঁহার গলা টিপিতে আসিতেছে। কিন্তু সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়াটি ব্যক্ত করিয়াছেন সর্বাধিনায়িকা। তিনি আওয়াজ তুলিয়াছেন, 'আমরা সবাই চোর। আমাদের গ্রেপ্তার কর।' কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদন্ত চলাকালিন প্রশাসনিক প্রধানের এহেন মন্তব্যে বিস্মিত রাজ্যবাসী বলিতেছেন— 'ঠাকুরঘরে কে আমি তো কলা খাইনি।'□

১২ অগ্রহায়ন ১৪২১

শোক সংবাদ

কমরেড আরতি দাশগুপ্ত

শ্রমজীবী আন্দোলনের প্রবীণ নেত্রী কমরেড আরতি দাশগুপ্ত ২৮ নভেম্বর ২০১৪ বিকেলে প্রয়াত হয়েছেন। ১৩ নভেম্বর ২০১৪ অসুস্থ হয়ে ইকবালপুরের একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। ২৫ নভেম্বর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তাঁর এক পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি বর্তমান।

কমরেড আরতি দাশগুপ্ত ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণআন্দোলনে যুক্ত হন। প্রয়াত বামপন্থী সাংসদ ড. বিপ্লব দাশগুপ্তের সঙ্গে বিবাহের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে ইংল্যান্ডে চলে যান। সেখানে কমরেড আরতি দাশগুপ্ত কয়লা খনির শ্রমিকদের উপর ডক্টরেট করেন। কলকাতায় ফিরে তিনি চটকল, আই সি ডি এস-সহ নানা ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন শ্রমিক আন্দোলনের এক অগ্রণী নেত্রী। তিনি সি আই টি ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভানেত্রী ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সি আই টি ইউ-র কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্যা।

কমরেড আরতি দাশগুপ্ত ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সি পি আই(এম) প্রার্থী হিসাবে দু'বার জিতে রাজ্য বিধানসভার সদস্যা ছিলেন।□

সমীরণ দেব

পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড সমীরণ দেব গত ২২ অক্টোবর '১৪ সেপ্টিসেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বেলভিউ নার্সিংহোমে প্রয়াত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। তিনি রেখে গেছেন বৃদ্ধ মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য পরিজনদের।

১৯৪২ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ঢাকুরিয়ার পৈতৃক বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। ১৯৬২ সালের ২১ জুলাই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষা অধিকারে নিম্নবর্গীয় করণিক পদে যোগদান করেন।

১৯৭৬ সালে সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালে যুগ্ম সম্পাদক ও ১৯৮৭-তে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এই পদে থেকে নেতৃত্ব দেন। বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি ছিলেন অবিচল। অবসরের পরে বাইরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

গত ১২ নভেম্বর '১৪ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে তার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব সহ বিভিন্ন বক্তা তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।□

পি আর সি-কে সাহায্য প্রদান

গত ১০-১১-২০১৪ তাং পঃ বঃ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির জেলা কমিটির সভা অরবিন্দ ভবনে (সমিতি দপ্তরে) অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় সমিতির সদস্য অপূর্ব মুখার্জীর পক্ষে তার কন্যা ও পুত্রবধূ 'পিপলস্ রিলিফ কমিটি'র কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি প্রবীর মুখার্জীর হাতে এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন। কমঃ অপূর্ব মুখার্জীর বর্তমানে অসুস্থ ও শয্যাশায়ী অবস্থায় শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন রয়েছে। উপরোক্ত সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির জেলা সম্পাদক কমঃ আনন্দ গোপাল রায়চৌধুরী। এছাড়াও সভাতে বর্ষিয়ান নেতৃত্ব তথা জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক শিশির দাশগুপ্ত বক্তব্য রাখেন। সভাতে সভাপতিমণ্ডলীর দায়িত্ব পালন করেন জিতেন্দ্র দেববিশ্বাস ও নরেন দেব। সভাতে প্রায় ১৫০ জনের মতো সমিতির সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক হিসাবে দায়িব পালন করেন দিলীপ চৌধুরী।□

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে নাগরিকরা হবেন ভিক্ষুক

আদপে গণতন্ত্র বিরোধী

স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচীর প্রচারে যে ছবি তুলে ধরা হচ্ছে, মান্যগণ্য বক্তিবর্গ বিভিন্ন এলাকায় যাচ্ছেন এবং লিম্যুজিন থেকে নেমে সাফাই কর্মীদের দ্বারা আগে থেকেই তাঁদের জন্য যত্ন করে সাজিয়ে রাখা পরিষ্কার জঞ্জালে (গাছের পাতা বা ঐ ধরনের কিছু) ঝাড়ু মারছেন— তা এক ধরনের নিম্নরুচির পরিচয় দেয়। একটি আপত্তিকর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর ছবি তুলে ধরে। মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গের কয়েক মিনিটের জন্য হাতে ঝাড়ু তুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে, তাঁদের সাথে সমাজের প্রকৃত ঝাড়ুদার শ্রেণীর প্রভেদ বিন্দুমাত্র ঘোচে না, বরং তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং স্পষ্ট হয়। এই যে দলিত সমাজের মধ্যে অকস্মাৎ প্রবেশ করে কৃতার্থ করার ভঙ্গীমা, তা কার্যত সামাজিক অবস্থানের যে বৈষম্য তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। যদিও মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি অত্যাধিক বিরূপ মনোভাব পোষণের কোন কারণ নেই। এঁরা সবসময়েই চায় যে প্রচারের আলো তাঁদের ওপর পড়ুক। সুতরাং তথাকথিত 'দেশপ্রেমিক' সেজে ছবি তোলার এমন সুবর্ণ সুযোগ তাঁরা যে হাতছাড়া করবেন না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যা সর্বাধিক চিন্তার কারণ তা হল, এখন রাষ্ট্রই এই ধরনের আপত্তিকর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে সওয়াল করছে।

একটা পরিসংখ্যান বলছে, স্বচ্ছ ভারতের জন্য প্রয়োজন ১২ কোটি শৌচালয় এবং তার জন্য খরচ পড়বে ১.৯৬ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু এই অর্থ যোগানের ব্যবস্থা সরকারের বাজেট থেকে না করে, মূলত চেষ্টা করা হচ্ছে কর্পোরেট গোষ্ঠীকে সামাজিক দায়বদ্ধতায় উৎসাহিত করে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে। এমনকি এই কাজের জন্য যে অতিরিক্ত শ্রমশক্তির প্রয়োজন, তার বন্দোবস্ত সরকারী দপ্তরে নতুন নিয়োগের মাধ্যমে যে করা হবে তাও নয়, স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে এই কাজ করানো হবে। সুতরাং সমস্ত নাগরিকের কাছে স্বাস্থ্যসম্মত পরিষেবা পৌঁছে দেবার জন্য যে পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার, রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, কর্পোরেট গোষ্ঠীর হাতে সেই দায়িত্ব তুলে দিতে চাইছে।

এই পরিকল্পনার পরিণতি হবে বিপুল সামাজিক অধঃপতন। যে কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা হল নাগরিক সমাজের প্রাথমিক চাহিদাগুলি পূরণ করা। ভারতে সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিসমূহ রাষ্ট্রের এই দায়িত্বগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। একই সাথে নাগরিকদেরও রাষ্ট্রের কাছে এই সমস্ত বিষয়ে দাবি করার অধিকার রয়েছে। এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুস্থ প্রক্রিয়াই নাগরিক সমাজকে প্রয়োজনীয় মর্যাদা প্রদান করে এবং সমস্ত নাগরিক সমতামূলক সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি হল এটাই। অন্যদিকে একজন নাগরিক কখনই দাবি করতে পারেন না যে, কর্পোরেট হাউস এসে তাঁর অথবা তাঁর প্রতিবেশীর বাড়িতে শৌচালয় তৈরি করে দিয়ে যাক। সুতরাং কর্পোরেট গোষ্ঠীকে সামাজিক দায়িত্ব পালন এবং দাতব্য পরিষেবা পৌঁছে দেবার আহ্বান জানানো একটি অন্তঃসারশূণ্য প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসম্মত পরিকাঠামোর জন্য মানুষকে কর্পোরেট গোষ্ঠীর দাক্ষিণ্যে উপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে তাঁদের তা পেতে হবে কর্পোরেট দরজায় দরজায় ভিক্ষাবৃত্তি করে। তাঁদের কর্পোরেট গোষ্ঠীর কাছে কিছু অর্থের জন্য হত্যে দিতে হবে, ঠিক যেমন ভিক্ষুক মোটা ভিক্ষের জন্য সক্ষম দানশীল মানুষ খুঁজে বেড়ায়।

সুতরাং উপযুক্ত পরিকাঠামো ভিত্তিক স্বাস্থ্যবিধান গড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে, কর্পোরেট গোষ্ঠীর তথাকথিত বিবেকের ওপর ছেড়ে দেওয়া পরিণতি হবে মারাত্মক। এর ফলে জনসাধারণ রাষ্ট্রের মর্যাদাপূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা খুইয়ে পরিণত হবেন তাঁদের দেশেরই কিছু বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল ভিক্ষুকে।

সুতরাং জাঁকজমক পূর্ণ স্বচ্ছ ভারত পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ভারতের গণতান্ত্রিক চরিত্রের আদর্শগত ধারণার উপর একটা বিশাল ধাক্কা এবং একে দূর্বল করার তাত্ত্বিক ব্যাবস্থাপনা।

একই কথা বলাচলে কর্পোরেটগোষ্ঠী বা কোন স্বনামখ্যাত ব্যক্তির কোন একটি গ্রামের দায়িত্ব নিয়ে তার মানোন্নয়নের পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও (শোনা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যেই এমন একটি গ্রামের দায়িত্ব নিয়েছেন)। কর্পোরেট দাক্ষিণ্যপ্রাপ্ত এমন একটি গ্রামের মানুষের কাছে এই প্রাপ্তি কখনই মর্যাদাপূর্ণ হবে না। এবং যখন কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গ্রামোন্নয়নের জন্য এমন একটি রাস্তাকে সরকারী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে বেছে নেয়, তখন সেই রাষ্ট্র সাংবিধানিক দায়িত্বকে অমান্য করে, এবং নাগরিকদের ভিক্ষুকের পর্যায়ে নামিয়ে এনে গণতন্ত্রের মর্মবস্তুকে ধ্বংস করে।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন, বড় বেশি কর্পোরেটবিরোধী মনোভাব থেকেই এই কথাগুলো বলা হচ্ছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এমন যাঁরা ভাবছেন, তাঁদেরও ভাবনাতেও অন্তর্নিহিত রয়েছে আদর্শগতভাবে গণতন্ত্রকে পরিত্যাগ করার বাসনা। নাগরিকত্বের মর্যাদাকে হ্রাস করে ভিক্ষুকে পর্যবসিত করার এই পরিকল্পনা আমাদের তেমনভাবে নাড়া দিচ্ছে না কারণ, সমাজের উচ্চকোটিতে বসবাসকারী আমরা কখনই সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ সর্বজনীন নাগরিকত্বের ধারণাটাকে গুরুত্ব দিই নি। এটা ঠিক সমাজের পশ্চাদপদ অংশেরও ভোটাধিকার রয়েছে, কিন্তু তাবলে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের সাথী হিসেবে আমরা ভাবতে শিখিনি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতাতো দূরের বিষয়, এমনকি আইনী সমতাও উচ্চকোটির ভারতবাসীর একাংশের কাছে কষ্টকল্পিত মনে হয়েছে। সংবিধান যাই বলুক, নাগরিকের সর্বজনীন সমমর্যাদা আদর্শগতভাবে গুরুত্ব পায়নি বললেই চলে। এই মানসিক গঠনের পরম্পরাকেই আইনী ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো হচ্ছে, যা যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ। সমাজে জাত-পাতের প্রভেদ আমাদের যে মানসিক গঠন তৈরি করে দিয়েছে, তার সাথে এই পরিকল্পনা বেশ মানানসই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পরিকল্পনার চালিকা শক্তি হল 'নয়া উদারবাদ'।

আদর্শগতভাবে গণতন্ত্রের মর্মবস্তুকে অস্বীকার করার যে কথা এতক্ষণ বলা হল তার বাইরে আরও একটি যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে। তা হল স্বাস্থ্যসম্মত পরিকাঠামো গড়ে তোলার মত প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই। এই বক্তব্য সত্যের অপলাপ মাত্র। কারণ কর্পোরেট গোষ্ঠী তাদের তথাকথিত বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে এই কাজে যে অর্থ বিনিয়োগ করবে বলে ভাবা হচ্ছে, সেই অর্থ রাষ্ট্রও সহজেই আদায় করতে পারে কর্পোরেটগোষ্ঠীর উপর কর চাপিয়ে। এতে অর্থের সংস্থানও হবে আর নাগরিকদেরও মর্যাদা খুইয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করতে হবে না। কিন্তু রাষ্ট্র এমন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজের জন্যও কর্পোরেটদের উপর কর চাপাতে পারবে না। কারণ নয়া উদারবাদী অর্থনীতিতে এই পরিকল্পনার কোনো স্থান নেই। রাষ্ট্র আর্থিক বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে কর্পোরেটদের জন্য অর্থের সংস্থান করতে পারে বা তাদের বিভিন্ন ধরনের ছাড় দিতে পারে, কিন্তু মানুষের কল্যাণের জন্য কর্পোরেটদের কাছ থেকে কিছু আদায় করতে রাষ্ট্র পারবে না। ফলস্বরূপ নয়া উদারবাদী অর্থনীতিতে যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে বিদেশী বিনিয়োগ টেনে আনার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তেমনই কর্পোরেট দাক্ষিণ্যে শৌচালয় নির্মাণের জন্য একটা গ্রামকে আর একটা গ্রামের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। ফলে এতদিন পর্যন্ত যা ছিল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাকে গ্রামস্তরেও টেনে নামানো হচ্ছে। নয়া উদারবাদের অপ্রতিরোধ্য যুক্তিতেই এখন ভিক্ষুক দেশের মধ্যে ভিক্ষুক গ্রাম তৈরি হবে।

এর মধ্য দিয়ে তথাকথিত 'চুঁইয়ে পড়া' তত্ত্বের নতুন পান্ডিত্যপূর্ণ মোচড় আমরা শুনতে পাচ্ছি। যেমন প্রথমে বলা হত, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল কর্পোরেটতন্ত্রের স্বার্থ সুরক্ষিত করা। কারণ তাহলে আর্থিক বৃদ্ধির সুফল চুঁইয়ে চুঁইয়ে সমাজের সব মানুষের কাছে পৌঁছবে। কিন্তু এই তত্ত্ব যখন দাঁড়ালো না, তখন বলা হল, রাষ্ট্র যদি কর্পোরেটতন্ত্রের স্বার্থ দেখে তাহলে আর্থিক বিকাশের হার বৃদ্ধি পাবে এবং এর সুফল যদি নিজে থেকে চুঁইয়ে নীচের দিকে নাও নামে, তাহলেও রাষ্ট্র অনেক বেশি কর-রাজস্ব আদায় করতে পাবে এবং তা সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু যখন সে তত্ত্বও হালে পানি পেল না (এমন কি 'রেগা'-ও গুটিয়ে ফেলার তোর-জোর চলছে), তখন বাজারে নতুন তত্ত্ব এল—রাষ্ট্র যদি কর্পোরেটতন্ত্রের স্বার্থ দেখে তাহলে আর্থিক বৃদ্ধির ফলে কর্পোরেট জগতের হাতে যে বর্ধিত উদ্বৃত্ত জমা হবে, তা দিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবে। এই সমস্ত যুক্তির মূল কথাটিই হল রাষ্ট্র কর্পোরেটতন্ত্রের স্বার্থে কাজ করবে। আমাদের দেশে এবং সাধারণভাবে গোটা পৃথিবীতে আমরা যা দেখছি তা হল, সার্বভৌমত্বের জনপ্রিয় ধারণার পরিবর্তে রাষ্ট্রের নতুন ভূমিকা। সার্বভৌমত্বের জনপ্রিয় ধারণা কার্যকরী হয় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে। এবং তা তখনই ফলপ্রসু হতে পারে যখন মানুষের জীবন-মান উন্নয়নে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে। মানুষ তখনই সার্বভৌম, যতক্ষণ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় তার নিজস্ব জীবন মানের উন্নয়নের সুযোগ থাকে। উল্টো দিক থেকে বলা যায় মানুষের জীবন মানের উন্নয়নের দায়িত্ব শুধুমাত্র রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রের এই ভূমিকাকে সমাজতান্ত্রিক, সমাজবাদী গণতান্ত্রিক এবং এমনকি উদারবাদী গণতন্ত্রপন্থী রাজনৈতিক শিবিরও সমর্থন করত।

কিন্তু আজ এই সর্বসম্মত ধারণাকে পরিকল্পিতভাবে হেয় করা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রও দূর্বল হয়। কারণ সরকার পরিবর্তন হলেও কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থ দেখার কাজটাই যদি চলতে থাকে, তবে মানুষ ভোট দেবে কেন? □

[মূল লেখা ঃ প্রভাত পট্টনায়েক এমিরেটাস অধ্যাপক, জওহর লাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লী।

সূত্র ঃ এশিয়ান এজ পত্রিকা ১৮ নভেম্বর ২০১৪ অনুবাদ ঃ সুমিত ভট্টাচার্য]

রাজ্যে পুরভোটের মুখে বঞ্চিত গৃহহীন বস্তিবাসী পরিবার

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে বসে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যতই চিৎকার করুন, তাঁর সরকার নরেন্দ্র মোদীর সংস্কার-কর্মসূচীতে সম্মতি দিয়ে বস্তিবাসীদের গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছেন। 'মা-মাটি-মানুষের' সরকারের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের আলোচনাক্রমে রাজ্যের পনেরো হাজার বস্তিবাসী পরিবারের গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছে। এর মধ্যে কলকাতার গার্ডেনরিচ, ধাপার তিনটি ওয়ার্ডের আট হাজার পাঁচশ' ছাপ্পান্নটি বস্তিবাসী পরিবারের বাড়িও রয়েছে। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের এই সিদ্ধান্তকে নরেন্দ্র মোদী সরকার স্বাগত জানিয়েছে। সারা দেশে কোন্ রাজ্য সর্বাধিক গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা রদ করেছে এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে। সারা দেশের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা এক লক্ষ পাঁচ হাজার, প্রথম স্থানে মধ্যপ্রদেশ, যারা ১৮৩৯৮টি বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা বাতিল করেছে। তারপরের স্থান পশ্চিমবঙ্গের। বাতিল করা হয়েছে ১৪৮৭৬টি গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা। দেশে ২০০৫-২০০৬ সাল থেকেই বস্তিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পাকা গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে। এর জন্য দুটি প্রকল্প রয়েছে। আমাদের রাজ্য ২১১৩৪৭টি বস্তিবাসী পরিবারের গৃহ নির্মাণের জন্য অনুমোদন পেয়েছিল। দুটি প্রকল্পই ২০১২-র মার্চের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও পরে এর লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করা হয় ২০১৫-র মার্চ পর্যন্ত। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এই তিন বছরের মধ্যে কোন নতুন গৃহ নির্মাণের অনুমোদন দেয়নি। ২০১২-র মার্চে রাজ্যে অনুমোদিত অনির্মিত বাড়ির সংখ্যা ছিল ৩৭৬৮৩। কেন্দ্রে সরকারের আসীন হওয়ার পরই বিজেপি সরকার রাজ্যগুলিকে কিছু গৃহ নির্মাণের কাজ পরিকল্পনার মধ্যে না রাখার কথা বলে। চিঠি (১৫০/কে এম ডি এ/ডি জি ও/ জেনারেল-৩১৩, তারিখ-৩০/০৭/২০১৪) লিখেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সম্মতির কথা জানিয়েছে। এর ফলে বর্তমান রাজ্য সরকার ১৪৮৭৬টি বস্তিবাসীর গৃহ নির্মাণের প্রকল্প থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নিল।

২০০৪ সালে বামপন্থীদের সমর্থনে প্রথম ইউ পি এ সরকার গঠিত হয়। ওই সময়েই বামপন্থীদের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার রেগার মত বেশ কিছু সামাজিক কর্মসূচী ও প্রকল্প গ্রহণে বাধ্য হয়। এর মধ্যে অন্যতম, বেসিক সার্ভিস ফর আরবান পুত্তর (বি ইউ এস পি) ও ইন্টিগ্রেটেড হাউসিং অ্যান্ড স্লাম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আই এইচ এস ডি পি)। এই দুটি প্রকল্পে ২১১৩৪৭টি বস্তিবাসী পরিবারের গৃহ নির্মণের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয়েছিল। বিগত সরকারের আমলে অর্থাৎ ২০১১-র মার্চের মধ্যে ১৬০০০০ বস্তিবাসীর বাড়ি তৈরি হয়ে যায়। বিগত তিন বছরের 'পরিবর্তন'-এর সরকারের আমলে ১২০০০-এর বেশী কিছু বাড়ি তৈরি হয়েছে। যার মধ্যে বেশ কিছু ছিল ২০১১-তে নির্মিয়মান কিছু বাড়ি।

রাজ্য সরকার যে ১৫ হাজার বাড়ি না বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সবগুলিই কে এম ডি এ এলাকায়। কলকাতা কর্পোরেশন অন্তর্গত রাজারঘাট এলাকায় যে ৬৩৮০টি গৃহ নির্মাণের অনুমোদন মিলেছিল তার মধ্যে ৬২৮০টি গৃহ নির্মাণ না করার ('সারেন্ডার') সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকার গত সেপ্টেম্বর মাসে। ২০০৮ সালে বামফ্রন্ট পরিচালিত পুর বোর্ডের আমলে কলকাতার ৫৮ নং ওয়ার্ডের আনন্দনগর, ৫৯ নং ওয়ার্ডের জালপাড়া ও গার্ডেনরিচের ১৩৮ নং ওয়ার্ডে বস্তিবাসীদের জন্য মোট ২৫০০টি গৃহ নির্মণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রথম দফায় ১০০টি বাড়ি নির্মাণের কাজ প্রাথমিকভাবে শুরু হয়। ২০১০ সালে পুর নির্বাচনে জয়ী হয়ে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রকল্পের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বর্তমান পুর বোর্ড ২১৮০টি বাড়ি না নির্মাণের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও বঞ্চিত হচ্ছে ব্যারাকপুরে ৩০০, নৈহাটিতে ১২০০, বরানগরে ১৫০, রাজপুর-সোনারপুরে ১১৮, চাঁপদানির ১৩৬০ ও কামারহাটির ৭১৯ বস্তবাসী পরিবার। □

মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী

ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

সাম্প্রদায়িকতার বিপদ বর্তমান আন্তর্জাতিক জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতির পটভূমিতে এক নতুন মাত্রা অর্জন করেছে। বিশেষত আন্তর্জাতিক স্তরে মুসলিম মৌলবাদপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ ভয়ঙ্কর মাত্রা নিয়েছে। ইতোমধ্যে 'ইসলামিক স্টেটস অব ইরাক অ্যাণ্ড সিরিয়া' (আই এস আই এস যা বর্তমানে আই এস নামে পরিচিত) ইরাকের উত্তর অঞ্চল এবং সিরিয়ার একটা অংশ দখল করে নিজেদের রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেছে। যিনি এর প্রধান তিনি নিজেকে নয়া খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেছেন। নাইজেরিয়ায় বোকো হারাম গোষ্ঠী ইতোমধ্যে উচ্চমাধ্যমিক ৩০০ ছাত্রীকে অপহরণ করে তাদের যৌন দাসী করেছে। এর পাশাপাশি আলকায়দা, তালিবান প্রমুখ সংগঠনের হিংসাত্মক তৎপরতা তো রয়েইছে।

আমাদের দেশে ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের পর ফ্যাসিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী চরম দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী শক্তি আর এস এস পরিচালিত বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে কার্যত একদলীয় সরকার গঠন করেছে। এবারের ষোড়শ সংসদে মাত্র ২২ জন মুসলিম সাংসদ রয়েছে, স্বাধীনতা উত্তরকালে এর কোনও পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। বিজেপি'র ক্ষমতাসীন হওয়ার ঘটনা নিছক একটি বুর্জোয়া সরকারের পরিবর্তে আর একটি বুর্জোয়া সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর নয়। কারণ ফ্যাসিস্ট মতাবলম্বী আর এস এসের শাখা হিসাবে বিজেপি'র অবস্থান অন্য দলের থেকে আলাদা। বিজেপি পূর্বেও ১৯৯৮-২০০৪ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু সেই সময়কার বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকার এবং বর্তমানের বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকারের পরিপ্রেক্ষিতগত পার্থক্য আছে। প্রথমত, বাজপেয়ী পরিচালিত প্রথম এন ডি এ সরকারে বিজেপি'র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না, ফলে তাকে জোট শরিকদের উপর নির্ভর করে থাকতে হতো। এবারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন। দ্বিতীয় এন ডি এ সরকার কার্যত বিজেপি'র সরকার। দ্বিতীয়ত, প্রথম এন ডি এ সরকারের সময় সংসদে বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেসের আসনসংখ্যা প্রায় বিজেপি'র সমান ছিল। কিন্তু এবারে উভয় দলের আসনসংখ্যার মধ্যে পার্থক্য বিপুল। তৃতীয়ত, প্রথম এন ডি এ সরকারের আমলে আঞ্চলিক দলগুলি যারা প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষ, তাদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এবারে চিত্রটা বিপরীত। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবাংলার টিএমসি, ওড়িশার বিজেডি এবং তামিলনাড়ুর এ ডি এম কে বাদে অবশিষ্ট আঞ্চলিক দলগুলি অল্পসংখ্যক আসনে জয়ী হয়েছে। পূর্বোক্ত তিনটি দল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসনে জয়ী হলেও দীর্ঘসময় ধরে এরা বিজেপি'র সহযোগী ছিল। তাছাড়া এদের আসনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও জাতীয় রাজনীতিতে এরা কোনও ভূমিকাই পালন করতে পারবে না। সর্বোপরি প্রথম এন ডি এ সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথম সারিতে থাকা বামপন্থীদের আসনসংখ্যা ছিল পঞ্চাশের বেশি। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের বিপর্যয় ঘটেছে যা ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পক্ষে এক বড় বিপদ।

রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ বাড়ছে। সম্প্রতি দু'টি বিধানসভার উপনির্বাচনের ফলাফল বিশেষভাবে ইঙ্গিতবহ। বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার উপনির্বাচনে বামপন্থীদের শক্তিশালী ঘাঁটি গ্রামাঞ্চলে (যেখানে নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ হল মুসলিম) তৃণমূল কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে বিজেপি'র বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বামপন্থীদের নয়, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। আবার টাকী ও বসিরহাট শহরে (প্রধানত মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত) বিজেপি বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে। উপনির্বাচনের এই ফলাফল আগামীদিনে এক অশুভ ইঙ্গিত বহন করছে। যে তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘ ছয় বছর ধরে বিজেপি জোটে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ নিয়েছে, সেই তৃণমূল কংগ্রেসকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতার বিপদে ত্রাতা বলে মনে করছে। অন্যদিকে মাত্র কয়েকমাস পূর্বে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে নরেন্দ্র মোদী 'দুই লাড্ডু'র গল্প শুনিয়ে ছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সেই বিজেপিকে ভরসা করছে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত-উচ্চ-মধ্যবিত্ত-হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীদের এক বড় অংশ।

সদ্য প্রয়াত ঐতিহাসিক অধ্যাপক ড: বিপান চন্দ্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ' গ্রন্থে সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যা মধ্যবিত্তদের পশ্চাদপদ অংশের মধ্যে থাকে। নির্বাচনের সময় সাম্প্রদায়িক ভোটের স্বার্থে একে উস্কে দেয়। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতির এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের শামিল হতে হবে।

এক

সাম্প্রদায়িকতার প্রধান উপাদান তিনটি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা উত্তেজনা প্রশাসনিকভাবে মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বা মতাদর্শ মোকাবিলা প্রশাসনিকভাবে হয় না, একে মতাদর্শগতভাবে মোকাবিলা করতে হয়।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা উত্তেজনা ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাম্প্রদায়িকতার প্রধান কারণ ধর্ম। বস্তুতপক্ষে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্য মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ব্যক্তিগত স্তরেও দেখা গেছে যে ধার্মিক ব্যক্তি কখনই সাম্প্রদায়িক হয় না, বিপরীতপক্ষে সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি কখনই ধার্মিক হয় না। উদাহরণ স্বরূপ মহম্মদ আলি জিন্নার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি কোনদিন কোরাণ পাঠ করেননি, মসজিদে যেতেন না, নামাজ পড়তেন না, অর্থাৎ এককথায় বলা চলে যে, ইনি ইসলাম ধর্মের কোনও অনুশাসনই মানতেন না। অথচ তিনি হয়ে গেলেন ইসলাম ধর্মের সব থেকে বড় প্রবক্তা। 'ইসলাম বিপন্ন' শ্লোগান তুলে তিনি ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের দাবী তুললেন। অন্যদিকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি। ইসলাম ধর্মের প্রতিটি অনুশাসন তিনি মেনে চলতেন। অথচ তিনি কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় লর্ড মাউন্ট ব্যাটনের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত ভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন জওহরলাল নেহরু এবং তাঁকে সমর্থন করেছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল। কিন্তু ভারত ভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। একইভাবে বলা চলে যে গান্ধী ছিলেন হিন্দু ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক। কিন্তু তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। যে কারণে তাকে অর.এস.এস. কর্মীর গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। আবার আদবানী, মুরলী মনোহর যোশীরা হিন্দু ধর্মের কোনও অনুশাসন না মানলেও তাঁরা হয়ে উঠেছেন হিন্দুত্বের সবথেকে বড় রক্ষক।

ধর্ম সম্পর্কে চলন্তিকায় বলা হয়েছে, "ধর্ম হলো সাম্প্রদায়িক উপাসনা পদ্ধতি, সংস্কার রীতি-নীতি, ঈশ্বর, পরকাল ইত্যাদি বিষয়ক। বস্তুতপক্ষে ধর্ম বিভিন্নভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে। মানুষের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, চলচিত্র, ভাস্কর্য-এর অনেকটাই ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে জড়িয়ে আছে। আমাদের অনেকের নামের সাথে দেব-দেবীর নামের মিল আছে। বিশ্বের তিনটি বৃহত্তম উৎসব খ্রীষ্টমাস, মহরম এবং দুর্গোৎসব-এর সাথে ধর্মের যোগ রয়েছে। ভারতে ছয়টি বৃহৎ ধর্মের সাথে যুক্ত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর বাস রয়েছে। এর মধ্যে চারটি ধর্মের উৎসস্থল হলো ভারতবর্ষ। ভারতে ২৯টি বড় ধর্মীয় সাংস্কৃতিক উৎসব রয়েছে।

ধর্মীয় মৌলবাদের দুই রূপ

সমাজতত্ত্ববিদ বা দার্শনিকরা ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজের বিকাশকে আলোচনা করেননি। বিভিন্ন দিক থেকে তারা এই আলোচনা করেছেন। যেমন কোনও কোনও দার্শনিক মনে করেন যে প্রাক ধর্ম আদিম বিশ্বাস থেকে ধর্মের উৎপত্তি। দার্শনিক টাইটলার বা মুলার এই মতের প্রবক্তা ছিলেন। কোনও কোনও দার্শনিক ধর্মকে সামাজিক সংহতির বাহন রূপে দেখেছেন। এদের মতে ধর্ম হলো সামাজিক সংহতির বাহন। আবার কোনও কোনও দার্শনিক ধর্মের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের সন্ধান করেছেন এবং সমাজের যে শ্রেণী বিভাজন তার সাথে ধর্মের বিভাজনকে মিলিয়ে দেখেছেন। ধর্মকে একটা অর্থনৈতিক সামাজিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। মার্কস-এঙ্গেলস ছিলেন এই মতের প্রবক্তা। 'মার্কসের ক্যাপিটাল' এবং 'ইকনমিক অ্যান্ড ফিলজফিক্যাল ম্যানুস্ক্রিপট' এবং এঙ্গেলসের 'অ্যান্টি ড্যুরিং' গ্রন্থ এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্কস বলেছেন ধর্ম হ'ল 'হার্ট অব এ হার্টলেস ওয়ার্ল্ড, 'সোল অব এ সোললেস ওয়ার্ল্ড'। মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের লেখায় বিভিন্ন ধর্মের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু কোনও ধর্মকে উৎকৃষ্ট, কোনও ধর্মকে নিকৃষ্ট— এইভাবে চিহ্নিত করেননি।

ধর্মের সাথে সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য রয়েছে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড: বিপানচন্দ্র লিখেছেন, সাম্প্রদায়িকতা হল এমন একটি বিশ্বাস যে একজন মানুষ একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বার্থও এক ও অভিন্ন হয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ হ'ল সেই বিশ্বাস যে বিশ্বাস অনুযায়ী ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান, শিখরা ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায় যারা স্বাধীনভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত ও সংহত। এই বিশ্বাস অনুযায়ী একটি ধর্মের অনুবর্তীরা শুধুমাত্র ধর্মীয় স্বার্থেরই অংশীদার নন, বরং তাদের ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থ অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্বার্থগুলিও অভিন্ন"। বাংলাদেশের বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দিন ওমর তাঁর 'সাম্প্রদায়িকতা' গ্রন্থে লিখেছেন, "কোনও ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত তার ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ এবং তার ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে। এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির সাথে তার পরিচয় নাও থাকতে পারে, ব্যক্তি বিশেষ এক্ষেত্রে গৌণ।"

অর্থাৎ ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার পারস্পরিক তুলনা যদি আমরা করি তাহলে আমরা দেখবো যে, ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অর্থাৎ একজন মানুষ ধর্মনিষ্ঠ মানে সেই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই এই ধর্মনিষ্ঠা গড়ে উঠেছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে সম্প্রদায়গত বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক যুক্ত, এখানে ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ নয়। দ্বিতীয়ত, বদরুদ্দিন ওমরের ভাষায় ধর্ম হচ্ছে পরকালের ব্যাপার, ইহকালের কোনও ব্যাপার নয়। একজন ব্যক্তি এই কারণে ধর্মাচরণ করে যে তার ধারণা পরজন্মে সে সুখে থাকবে। অর্থাৎ ফলাফল এখুনি পাওয়া যায় না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদ গোটাটাই হচ্ছে ইহকালের ব্যাপার, এর সাথে পরজন্মের কোনও বিষয় নেই। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সবসময়ই আশু ফলাফল চায়। অর্থাৎ ধর্ম যেখানে (যারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করে) পরকালের ব্যাপার, সাম্প্রদায়িকতাবাদ সেখানে ইহকালকে সূচিত করেই গড়ে উঠেছে। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল যে, মানব সমাজের জন্মলগ্ন বা তার কিছু পর থেকেই ধর্মের উদ্ভব। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা একেবারেই আধুনিক বিষয়।

এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। ভারতে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম শাসকদের শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। সেই সময় বিশেষত ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিন্দু রাজাদের সাথে মুসলিম নবাবদের ক্ষমতার লড়াই হয়েছে কিন্তু কখনই তা হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায় পরিণত হয়নি। বস্তুতপক্ষে ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের উৎপত্তি— ব্রিটিশ আমলে। জওহরলাল নেহরু তাঁর 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। "এটা নিশ্চয়ই আমাদের দোষ, এই দোষের কর্মফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। তবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে সুচিন্তিতভাবে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে যেভাবে তা লালন পালন করেছে তার জন্য তাদের আমি কখনই ক্ষমা করতে পারব না। আমাদের উপর বহু আঘাত এসেছে, তা আমরা সামলে নিয়েছি কিন্তু ব্রিটিশের কল্যাণে প্রাপ্ত এই যে সাম্প্রদায়িকতা ভেদবুদ্ধির ক্ষত তা বহুকাল আমাদের জড়িত করতে থাকবে। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতাবাদকে যদি ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি তাহলে দেখবো যে, এটা একেবারে আধুনিক বিষয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে আসার পরই এর জন্ম"।

ব্রিটিশ ভারতে তিনটি বিষয়কে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্মের পর থেকে প্রেক্ষাপট বলে মনে করা হয়। প্রথমত, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর মধ্য দিয়ে যে ভূমি সম্পর্ক তৈরী হয়, তার মধ্য দিয়ে বঙ্গ দেশে জমিদার বা জমির মালিকদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু এবং অন্যদিকে ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষীদের সিংহভাগ ছিল মুসলমান। ফলে জমিদারদের সাথে যখন কৃষি মজুরি বা ফসলের অংশ নিয়ে লড়াই হয়েছে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তাকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ১৮৩৫ সালে লর্ড মেখলে যে শিক্ষানীতি চালু করে তা মুসলিমরা অনেক দেরি করে গ্রহণ করায় ইংরেজি এবং সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ অনেক পিছিয়ে পড়ে। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থ সামাজিক স্তরে সৃষ্টি হয় এক বিপুল বৈষম্য। তৃতীয়ত, ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকীকরণ ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাকে উভয় সম্প্রদায়ের ইতিহাসবিদরা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বা মতাদর্শ তার ভিত্তিকে খুঁজে পেয়েছে। সর্বোপরি এসবের উপর ভিত্তি করেই ব্রিটিশ শাসকরা তাদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' বা 'ভেদ কর ও শাসন কর' নীতিকে চালিয়ে গেছে, যা এখন সংঘ পরিবার 'ডিভাইড এ্যান্ড উইন' এই নীতিতে পরিণত করেছে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মূল আশু লক্ষ্য হল ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত করা। কংগ্রেস বা বিভিন্ন বুর্জোয়া দলের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো সমস্ত ধর্মকে মদত দেওয়া। কিন্তু ধর্মের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদ উৎসাহিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ হল ধর্মকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা। এরমধ্য দিয়েই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সরকারী অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করা, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার উপর আক্রমণের আর একটি ক্ষেত্র। তাছাড়া কোনও মন্ত্রী তাঁর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন, কারণ এটি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার; কিন্তু যদি তাঁর এই ধর্মাচরণ সরকারী প্রচার-মাধ্যমে প্রচার করা হয়, তা ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিকে আঘাত করে।

দুই

বর্তমান জাতীয় রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি যে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী চরম দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী আর.এস.এস. পরিচালিত বিজেপি শুধু সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতিতেই দক্ষ তাই নয়, আর্থ রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রেও তারা এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির প্রবক্তা।

আর্থিক নীতির প্রশ্নে তারা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও সরকারী কাজের বেসরকারীকরণের জোরালো সমর্থক। বিজেপি পরিচালিত প্রথম এন.ডি.এ

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে

দলিত হাজার কণ্ঠে বিপ্লবের আজো সম্বর্ধনা

শাশ্বতী মজুমদার

৭ নভেম্বর, ২০১৪। মস্কোয়-৫ ডিগ্রি তাপমাত্রাকে উপেক্ষা করে ৩০০০ মানুষ পথে নেমেছে। হাতে হাতে তাদের লাল পতাকা --তাতে আঁকা লেনিনের মুখ। গানে গানে, স্লোগানে উদ্বেল সেই মিছিল স্মরণ করছে ৯৭ বছর আগের আর এক ৭ নভেম্বরের রাশিয়াকে, যেদিন সে দেশের শ্রমিকশ্রেণী এবং দরিদ্র-মাঝারি কৃষক সম্প্রদায় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে পুঁজিপতি-ভূস্বামী শাসনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শাসনভার তুলে দিয়েছিল জনগণের 'সোভিয়েত' গুলির হাতে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের সেই সফল প্রয়োগের অগ্নিহোত্রী যিনি, তিনি লেনিন। তাই লেনিন আর নভেম্বর বিপ্লবের স্মৃতি একাকার। ''লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ, / অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।''

অন্যদিকে, মস্কোর রেড স্কোয়ারে সেদিন সামরিক বাহিনী মার্চ করে চলেছে, পুনরাভিনয় হচ্ছে ১৯৪১-এর ৭ নভেম্বরের, যেদিন 'রেড আর্মি' রেড স্কোয়ারে নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে মার্চ করে সেখান থেকেই যাত্রা করেছিল নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফ্রন্টে, দেশপ্রেমিক চেতনায় ইস্পাত দৃঢ় সেই বিপ্লবীবাহিনী যুদ্ধশেষে বিজয়পতাকা উড়িয়েছিল বার্লিনে, সভ্যতার ত্রাস হিটলারকে পরাস্ত করে। সেদিনের সেই গৌরবময় অধ্যায়ের নায়ক ছিলেন স্তালিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানকারী প্রাক্তন সেনাদের যারা এখনও জীবিত তারাও এসেছিলেন সেই কুচকাওয়াজে— তাঁদের স্মৃতিতে স্তালিনের উজ্জ্বল উপস্থিতি।

মস্কোয় শ্রমজীবিদের মিছিল বা সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজের ভিডিও ইউ টিউবে সওয়ার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে, আর অনিবার্যভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শে আস্থাশীল মানুষদের মনে পড়িয়ে দিচ্ছে ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯১-এর স্মৃতি। দূরদর্শনের পর্দায় সারা পৃথিবী এমনভাবেই প্রত্যক্ষ করেছিল নভেম্বর বিপ্লবের ৭৪ বছর পরে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন। একদল কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকের হাতে শ্রমিকশ্রেণীর সেই পরাজয়ের দিনে সেদেশের কোথাও কোনো প্রতিরোধ, প্রতিবাদও হয়েছিল বলে শোনা যায়নি। এই মস্কো এবং পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিভিন্ন শহরে টেনে নামানো হয়েছিল লেনিনের মূর্তি,

এই সেই রেড স্কোয়ারের 'মাওসোলিয়াম', যেখানে প্রতিদিন লেনিনকে শ্রদ্ধা জানাতে আজও মানুষ দীর্ঘ সারিতে অপেক্ষা করে, সেখান থেকে লেনিনের শবদেহ কবরে পাঠানোর চক্রান্ত করেছিল ইয়েলেৎসিন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। হিটলারের সমকক্ষ এক ফ্যাসিস্ট রক্তপিপাসু দানব হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছিল স্তালিনকে।

কিন্তু অভিজ্ঞতাই মানুষকে শিক্ষা দেয়। ইতিহাসের 'পরিসমাপ্তির তত্ত্বকে' ভুল প্রমাণ করে তাই ২০১৪-তে মস্কোর মিছিল বলছে --'লেনিনকে আমরা ভুলিনি' বলছে— ''স্তালিন না থাকলে, হিটলারকে কেউ হারাতে পারতো না, আজ এই পৃথিবী এইরকম থাকত না, শান্তি থাকত না, ওবামা তুমি থাকতে না।'' বলছে -- ''মহান নভেম্বর বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।''

****

''চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রেগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে ---- জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ-সুবিধে সবকিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে --- উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। ---- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবার পিছে, সবার নিচে থাকা এই সবহারারা, যারা সংখ্যায় বেশি, যারা 'সভ্যতার পিলসুজ' তারা যদিও তাদের বঞ্চনা, তাদের অপমান বেশিরভাগ সময়েই মুখ বুঁজে মেনে নিয়েছে, তবু যখনই শোষণ ব্যবস্থাটাকে তারা চিনতে পেরেছে, নিজেদের শ্রেণীপরিচয় সম্পর্কে সচেতন হয়েছে তখনই তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, বিরুদ্ধতার চাবুক হাতে নিয়ে, সভ্যতার ইতিহাস জুড়ে ছড়িয়ে আছে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের সেইসব অগণিত খণ্ড খণ্ড কাহিনী। কিন্তু সভ্যতার বাহন যারা তারা যে রাষ্ট্রক্ষমতাটাই দখল করে নিতে পারে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব যে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ করে, উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণ করতে এবং সমস্ত ধরনের শোষণের অবসানে দায়বদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, এই অসম্ভব বিষয়টিকে প্রথম সম্ভব করেছিল মহান নভেম্বর বিপ্লব।

এর আগে ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউনের বিপ্লবীরা শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র তৈরী করলেও তাকে স্থায়িত্ব দিতে পারেনি। সাময়িক পিছু হঠা বুর্জোয়ারা ১৮ মার্চ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত স্থায়ী সেই শিশুরাষ্ট্রটিকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে ধ্বংস করেছিল।

সেদিক থেকে নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্য হয়েছিল দীর্ঘস্থয়ী, দেশের ভেতরে ও বাইরে শত্রুশিবিরের অগণিত অবিরত চক্রান্তকে পরাস্ত করে ৭৪ বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নের বেঁচে থাকার মধ্যে দিয়ে মানুষের চোখ খুলে গিয়েছিল যে পুঁজির শোষণ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের প্রায় আড়াই দশক পরে যখন আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির আক্রমণ বল্গাহীন, দেশে দেশে সরকারী

মদতে বহুজাতিক কোম্পানির লুণ্ঠন চলছে তখন বিশ্বের মেহনতী মানুষের লড়াই আন্দোলনের সামনে সাহস, আশা ও উদ্দীপনা জাগানো এক আলোকময় মশালের মতো জাগরুক নভেম্বর বিপ্লবের গৌরব।

****

একশো বছর আগে ইউরোপের ধনবাদী দেশগুলি যখন অর্থনৈতিক আগ্রাসনের তাড়নায় পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়ে, তখন এমন এক সংকট ঘনীভূত হয় যা সূচনা করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের, সে যুদ্ধে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়ে উপনিবেশগুলির স্বার্থও। ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির যুদ্ধ ঘোষণার মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া সেই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছিল ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর প্যারিস চুক্তিতে, যেখানে আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ থেকে গিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার শাসিত রাশিয়ার অংশগ্রহণ সেখানকার মানুষকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল। চারিদিকে বেকারী, অনাহার, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য।

১৯১৭ সালের মার্চ মাসের (জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ফেব্রুয়ারী) বিপ্লবে স্বেচ্ছাচারী জার দ্বিতীয় নিকোলাইকে অপসারিত করে রুশ প্রাদেশিক সরকার গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া-অভিজাতদের সেই সরকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোনো সংকট নিরসনেই অক্ষম ছিল, উপরন্তু যুদ্ধ চালিয়ে যেতে তারা ছিল বদ্ধপরিকর, জনগণের দুর্দশা ঘোচানোর পরিবর্তে সমস্ত বিক্ষোভ-বিদ্রোহের ওপর তারা নামিয়ে আনল নিপীড়ণ। ১৯১৬-র তুলনায় ১৯১৭ সালে রাশিয়ার শিল্পোৎপাদন কমেছিল ৩৬ শতাংশ। শীত শুরু হওয়ার আগেই বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে ৫০ শতাংশ কারাখানা বন্ধ হয়েগেছিল। অন্যদিকে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছিল। ১৯১৩-র তুলনায় শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী হ্রাস পেয়েছিল ৫০ শতাংশ। সরকার প্রায় দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৭-র অক্টোবরে জাতীয় ঋণ ছিল ৫০০০ কোটি রুবল, এরমধ্যে বৈদেশিক ঋণ ১১০০ কোটি রুবল। ১৯১৭-র সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে মস্কো এবং পেট্রোগ্রাদের শ্রমিক, ডোনবাস, উরালের খনি-শ্রমিকরা, বাকুর তৈলখনির শ্রমিক, বস্ত্র শিল্পের শ্রমিক, ৪৪টি বিভিন্ন রেলওয়ের শ্রমিকদের অসংখ্য ধর্মঘট হয়েছিল। অংশগ্রহণ করেছিল প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক। ১৯১৭-এ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৪ হাজার কৃষকবিদ্রোহ হয়েছিল। পেট্রোগ্রাদ, মস্কো এবং অন্যান্য শহরে। দেশের উত্তর ও পশ্চিমে সেনাআবাসগুলিতে বিদ্রোহ হয়েছিল। বাল্টিক অঞ্চলের নৌসেনারাও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল।

এদিকে ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন দেশের শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও যখন সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে দেশপ্রেমিকের কর্তব্য পালন করার বিভ্রান্তিতে ভুগছে, লেনিন খুব স্পষ্ট ভাষায় 'বুর্জোয়াদের অঞ্চল দখলের বিশ্বযুদ্ধকে সর্বহারার বিপ্লব'এ পরিণত করার আহ্বান জানালেন। 'সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শৃঙ্খলে সবচেয়ে দুর্বল জোড়' অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ রাশিয়াকেই তিনি বিপ্লবের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় স্থান হিসাবে চিহ্নিত করলেন। তাঁর নির্ভুল তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করেছিল রাশিয়ার জনগণ। ধারাবাহিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাওয়া রাশিয়ার জনগণ বুঝেছিল, শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধির দাবি কৃষকের জমিদারি দখলের দাবি, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির দাবি, অত্যাচারিত জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের দাবি কোনোটিই দক্ষিণপন্থী বা সুবিধাবাদী রাজনৈতিক শক্তিগুলি পূরণ করতে প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছুক নয়, তাই তারা সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবীপ্রবাহে নিজেদের যুক্ত করতে পেরেছিল। একটা বিপ্লবকে সম্ভব করার আগে অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত, জাতি দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত রুশ জনগণের তার আগে দরকার ছিল নিজেদের দক্ষিণপন্থী ও সুবিধাবাদী রাজনীতির হাত থেকে মুক্ত করা। কঠিন পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য নিখুঁত বিপ্লবী কর্মপন্থা অনুসরণ এবং ধারাবাহিক প্রচার আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে যা তারা কখনই পারত না।

আজকের শ্রমজীবী আন্দোলনের সামনেও সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দক্ষিণপন্থা ও সুবিধাবাদী রাজনীতির কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করা। বিশেষ করে সোভিয়েত পরবর্তী বিশ্বে মানুষের ওপর পুজিঁবাদী আক্রমণ যখন নিরঙ্কুশ হয়েছে, আক্রান্ত শ্রমজীবী মানুষকে বিপথগামী করার জন্য বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারী নতুন নতুন তত্ত্বের আমদানি করা হচ্ছে, জাতি-ধর্ম-বর্ণের পরিস্থিতি ভিত্তিক বিদ্বেষ ছড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ সংগ্রামের পথ নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা হচ্ছে।

****

উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিকীকরণের ফলে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের উদ্দীপনায় দেশের উৎপাদন ক্ষমতাও যেন বদ্ধদশা থেকে নিষ্কাশিত হয়েছিল। কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার সুনিশ্চিত করেছিল রাষ্ট্র। মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করার হয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাফল্য ঘটেছিল অভাবিত মাত্রায়। সর্বস্তরে জীবনমানের সেই অসামান্য উৎকর্ষ রবীন্দ্রনাথের চোখেও ধরা পড়েছিল— ''আপাতত রাশিয়ায় এসেছি — না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভাল-মন্দ বিচার করার পূর্বে সর্ব প্রথমেই মনে হয় কী অসম্ভব সাহস।''

''এখানে এসে যেটা আমার চোখে ভাল লেগেছে সে হচ্ছে এই, ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভুষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে।''

''... যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না, সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এ সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয়নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের সকল সমস্যার বড় রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত — ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা যে কি আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে। তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়। তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়।''

অথচ পুঁজিবাদীদের পক্ষ থেকে 'ধনতন্ত্রই শেষ কথা' বলে যত আস্ফালনই করা হোক না কেন সমাজের সর্বস্তরে বিকাশ ঘটাবার ক্ষমতা যে পুঁজিবাদের নেইই এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। পুঁজিশাসিত দুনিয়ায় অসাম্যের প্রসারই শেষ কথা।

সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির অন্যতম হাতিয়ার আই.এম.এফ.-এর প্রধান ক্রিস্টিন লাগার্ডে বলেছেন বিশ্বে ১০ জনের মধ্যে ৭ জন গত ৩ দশকে বেড়ে ওঠা অসাম্যের শিকার। বিশ্বের প্রথম ৮৫ জন ধনী ব্যক্তির সম্পদ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার যে অর্ধাংশ বেশি গরীব তাদের মোট সম্পদের থেকে বেশি। সারা ইউরোপের বুকে অর্থনৈতিক সংকটে আক্রান্ত দেশগুলিতে শ্রমিকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে পে-কাট, পে-ফ্রিজের বোঝা। কাজের ঘণ্টা ৩৫ ঘণ্টা প্রতি সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ৩৭ ঘণ্টা প্রতি সপ্তাহ, কোথাও কোথাও ৪০ ঘণ্টা প্রতি সপ্তাহ করা হচ্ছে। যৌথদরকষাকষির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে দেওয়া হচ্ছে মালিকদের হাতে অপরিসীম ক্ষমতা তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে। অথচ সিইওদের বেতন বাড়ছে।

আমেরিকার উপরের দিককার বেতনভোগীদের ১ শতাংশের বেতন বেড়েছে ১৬৫ শতাংশ। আর উপরের দিককার .১ শতাংশের বেতন বেড়েছে ৩২৬ শতাংশ। এখন আর তাই 'তোমরা ১ শতাংশ, আমরা ৯৯ শতাংশ' নয়, আওয়াজ উঠছে 'তোমরা .১ শতাংশ আমরা ৯৯.৯ শতাংশ।

পুঁজিবাদীরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যত কুৎসা, যত বিভ্রান্তিই প্রচার করুক না কেন, সমাজতন্ত্রের কোনো 'বিকল্প' তারা হাজির করতে পারে নি, যা হবে অধিকতর মানবিক, যা মানুষের ক্ষুধা ঘোচাবে, কাজ দেবে, শিক্ষা দেবে। অথচ আজকে পুঁজির যে পাহাড় সঞ্চিত '.১ শতাংশের' হাতে, তার ন্যায়সম্মত বণ্টন হলে পৃথিবীকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, অশিক্ষা-অস্বাস্থ্যের দুর্দশা থেকে মুক্ত করা যেত।

আজ 'দেউলিয়া' পুঁজিবাদের সমর্থকদের বোঝার সময় এসেছে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা যায়, কিন্তু সমাজতন্ত্রের যে আদর্শ সোভিয়েত তুলে ধরেছিল তাকে ধ্বংস করা যায় না। আজকে যখন পৃথিবীর কোনো না কোনো প্রান্তে, কোনো না কোনো কারখানায়, কোনো না কোনো খনিতে, কোনো না কোনো কৃষিক্ষেত্রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষ উঠে দাঁড়ায় তখন তাদের মিছিলে, জমায়েতে, বিক্ষোভে, প্রতিবাদে, ধর্মঘটে লেখা হয় পুঁজিবাদের সর্বনাশের বার্তা, তাদের পদচিহ্ন এঁকে চলে অনাগত বিপ্লবের পথ, ফেরারী সেনাদের প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে থাকে পৃথিবী। নভেম্বর বিপ্লব সেই কথাই আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয়।□

কাউন্সিল সভা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবসের আলোচনাসভা, ৪ঠা আগস্ট-১২ই জুলাই কমিটিসহ অন্যান্য সংগঠনের আহ্বানে সাধারণ বাজেট ও রেল বাজেটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল, ২০ আগস্ট-২০১৪ এ আই এস জি ই এফ-এর আহ্বানে ৫ দফা দাবির সমর্থনে জাতীয় দাবি দিবস, ৩০ অক্টোবর ২০১৪ বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির আহ্বানে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মিছিল, ১৬ অক্টোবর ২০১৪—ডব্লিউ এফ টি ইউ-এর আহ্বানে এ আই এস জি ই এফ-এর উদ্যোগে 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাকশন ডে'-র কর্মসূচীতে 'আন-এমপ্লয়মেন্ট'—বিষয় নিয়ে ডঃ অসীম দাশগুপ্তের আলোচনা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সংগঠনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার প্রশ্নে তিনি বলেন, যে পরিস্থিতি দাবি করছে সংগঠনকে আরও দৃঢ় করতে আমাদের পুনরায় ব্লকস্তরে যেতে হবে। আগামী ১৮-২৫ নভেম্বর রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকে সফর করবেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা। যৌথ আন্দোলানের প্রশ্নে আমাদের বিগত ২৭ মার্চের অভিজ্ঞতা রয়েছে। রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতন পান এমন ১৫টি সংগঠনের পক্ষ থেকে যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে।

আগামী ১৪ নভেম্বর যৌথ কনভেনশন হবে মৌলালী যুবকেন্দ্রে। ইতিমধ্যে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে। যৌথ কনভেনশন থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে বকেয়া মহার্ঘভাতা, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বর্তমান পেনশন ব্যবস্থা চালু রাখা সহ ৬-দফা দাবিতে। সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আহ্বান জানানো হবে এই কনভেনশনে উপস্থিত থাকার জন্য। উদ্বোধন করবেন সি আই টি ইউ-এর পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী। বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে আগামী ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে কলকাতার ওয়াই চ্যানেলে লাগাতার গণঅবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে কনভেনশন থেকে। একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে পথসভা করা হবে এবং বিধানসভায় প্রতিনিধিত্বকারী সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আমাদের দাবিগুলি তুলে ধরা হবে, যাতে তারা আমাদের প্রতি বর্তমান সরকারের বঞ্চনার বিষয়গুলি বিধানসভায় তুলে ধরেন। আগামী ৫ ডিসেম্বর ২০১৪ সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির আহ্বানে ১০ দফা দাবির সমর্থনে—'জাতীয় প্রতিবাদ দিবস' কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ১৫তম জাতীয় সম্মেলন আগামী ২০-২৩শে ডিসেম্বর ২০১৪ পাঞ্জাবের চন্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত হবে। সর্বমোট ৯০ জন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন। একইসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক বলেন, যে বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্যে দিন দিন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। এদের তালিকা জেলা ও সমিতিকে তৈরি করতে হবে।

প্রশাসনে আমরা যেমন আক্রান্ত, তেমনই রাজ্য পরিস্থিতিরও ক্রমাবনতী ঘটছে। আজকে শ্রেণী আন্দোলন, গণ আন্দোলনকে ভেঙে দেওয়ার জন্য মৌলবাদকে ব্যবহার করা হচ্ছে। মিডিয়ার পক্ষ থেকেও সমস্ত ঘটনার সঙ্গে পুরোনো ঘটনাকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বামপন্থী ও বামপন্থাকে নিকেষ করার চেষ্টা চলছে। একইসঙ্গে রাজ্যে বর্তমান শাসকদলের বিরুদ্ধে বিজেপিকে সামনে আনার বিকল্প তৈরি করার চেষ্টা চলছে। আমরা যারা কিছুটা চেতনাসমৃদ্ধ, তারা জানি পরিস্থিতিকে অনুকূলে আনতে না পারলে দাবি অর্জন করা যাবে না, তাই আগামীর সমস্ত লড়াই আন্দোলনে আরও বেশি বেশি করে সামিল হতে হবে, আত্মত্যাগী, সাহসী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। পরবর্তীতে ১৪টি সমিতি ও ৪টি সহযোগী সংগঠনের আসন্ন সম্মেলন-এর উদ্বোধকদের নাম তিনি প্রস্তাব রাখেন।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবিত বিগত কর্মসূচীর মূল্যায়ন, আসন্ন লড়াই আন্দোলনের কর্মসূচী ও সাংগঠনিক পর্যালোচনার পরবর্তীতে ১৮টি জেলা ও কলকাতায় ৭টি অঞ্চলের পক্ষ থেকে আলোচনায় তাকে আরও তীক্ষ্ণ শানিত সমৃদ্ধ করা হয়। সমস্ত আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য পেশ করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক অসিত কুমার ভট্টাচার্য্য। জবাবী ভাষণ দিতে গিয়ে যুগ্ম সম্পাদক বলেন, যে ভারতবর্ষে আজ যে সরকার আসীন হয়েছে তারা যত কর্মসূচী নিচ্ছে তা সবই জনবিরোধী। এর ফলে আজ সাধারণ মানুষের সমস্যা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে নরেন্দ্র মোদী "আচ্ছে দিন"-এর যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তার স্বরূপ আজ বোঝা যাচ্ছে। আগ্রাসী পুঁজিবাদের প্রকাশ পেয়েছে সাধারণ বাজেট ও রেল বাজেটে। Planned Development-এর সমস্ত রূপ নস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে। রেগা-প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থ হ্রাস করা হচ্ছে। সরকার এমন শ্রমিক বিরোধী Industrial Dispute Act. প্রণয়ন করতে চলেছে যার ফলে মালিক, সরকারের অনুমতি না নিয়েই যে সমস্ত সংস্থায় অনধিক তিনশো শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করেন, সেখানে অনায়াসে ছাঁটাই করতে পারবে। কৃষিক্ষেত্রে সারের দামের ওপর ভর্তুকি কমিয়ে দিয়েছে। ব্যাঙ্ক, বীমা ক্ষেত্র বেসরকারিকরণের উদ্যোগ চলছে। ডিজেলের দাম নির্ধারণ করার দায়িত্ব বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সারা দেশে আজ পরিচিতি স্বত্তার নামে, ধর্মের ভিত্তিতে, বিভাজন চলছে। সাম্প্রদায়িকতার শুরশুরি দেওয়া হচ্ছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রমজীবী ঐক্যকে ধ্বংস করা। রাজ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। রাজ্যে চলছে লুম্পেন রাজ। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একথা মনে রাখতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গে এদের কোনো স্থান ছিল না। এর বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র পথ মতাদর্শ। সঠিক মতাদর্শ ছাড়া এর থেকে উত্তোরণের পথ নেই। সভা থেকে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে।

সাংগঠনিক বিষয়ে

১। সদস্যভুক্তির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট (জুলাই-সেপ্টেম্বর) সব সমিতি, জেলা ও অঞ্চলকে নভেম্বর ২০১৪ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে জমা দিতে হবে।

২। পত্র-পত্রিকার গ্রাহকভুক্তি করণের কাজ সমাপ্ত করে এবং গ্রাহক চাঁদা সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাতে হবে। বকেয়া গ্রাহক চাঁদা নভেম্বর ২০১৪ মাসের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে জমা দিতে হবে।

৩। জেলা, অঞ্চল ও সমিতির নেতৃত্বকে সংগঠনের সর্বস্তর পর্যন্ত গিয়ে সদস্য সংগ্রহ, গ্রাহকভুক্তি সহ দৈনন্দিন কাজে ও কর্মসূচীতে কর্মী কর্মচারীর উপস্থিতিকে আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রয়াস জারি রাখতে হবে।

৪। জম্মু-কাশ্মীর ত্রাণ তহবিল নভেম্বর মাসের মধ্যে কেন্দ্রে জমা দিতে হবে।

৫। **সাংগঠনিক সফরসূচী ঃ** আগামী ১৮-২৫শে নভেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ব্লকস্তরে সফরের কর্মসূচী পালিত হবে। ১৮টি জেলার ৩৪১টি ব্লকে সরাসরি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা সফরে যাবেন এর জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের যুক্ত থাকতে হবে। এর মধ্য দিয়ে সার্বিকভাবে সংগঠনকে আরো সংহত করে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর কর্মসূচীতে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

আন্দোলনগত কর্মসূচী ঃ ১। রাজ্যে সব ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন সমূহ ও ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে আগামী ১০ নভেম্বর ২০১৪ সারা রাজ্যে ও কলকাতায় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে।

২। রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠনগুলিকে নিয়ে ১৪ নভেম্বর ২০১৪ মৌলালী যুবকেন্দ্রে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। ঐ কনভেনশন-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভবিষ্যতে বৃহত্তর কর্মসূচী প্রতিপালিত হবে।

৩। আগামী ৫ ডিসেম্বর ২০১৪ সব ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির আহ্বানে ১০ দফা দাবির সমর্থনে— "জাতীয় প্রতিবাদ দিবস" কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় এই কর্মসূচীকে সাফল্য মণ্ডিত করতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। □

দেবাশিস রায়, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী

ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম নিরপেক্ষতা

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

সরকার মডার্ণ ফুডস, বালকো এবং সেন্টুর হোটেলসহ একাধিক সরকারী হোটেল জলের দামে বিক্রি করে দেয়। এবারেও প্রথম ছয় মাসের শাসনে রেল, প্রতিরক্ষা, বীমা, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বেসরকারীকরণ ও বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশকে নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান আই সি এইচ আর-এর শীর্ষ পদে একজন হিন্দুত্ববাদীকে বসানো হয়েছে।

দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিজেপি সওয়াল করে। এল.কে.আদবানি একটি প্রবন্ধে ভারতে ৬০টি রাজ্য গঠনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। ছোট ছোট রাজ্য মানে শক্তিশালী কেন্দ্র। আর শক্তিশালী কেন্দ্র হলে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও লগ্নীপুঁজির শোষণের পক্ষে তা অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

বিজেপি'র পররাষ্ট্র নীতি হলো চরম দক্ষিণপন্থী। তারা আমাদের দেশের জোট নিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিয়ে, স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তে মার্কিন স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের পররাষ্ট্র নীতিকে গড়ে তুলতে চায়। তাছাড়া জায়নবাদী ইজরায়েলী সরকারের সাথে বিজেপি সরকার সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষপাতী। এই কারণে বিগত জুলাই-আগষ্ট মাসব্যাপী যখন গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলী হানায় শত শত শিশু সহ কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়, তখন সংসদে এর বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনা এবং ভারত ইজরায়েল সামরিক অস্ত্র চুক্তি বাতিলের যে প্রস্তাব বামপন্থীরা এনেছিল, তা গ্রহণ করা হয়নি।

আর এস এস -বিজেপি চক্র ভূমি সংস্কারে বিশ্বাসী নয়। কৃষিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক সম্পত্তি সম্পর্ককে বজায় রেখেই, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে কৃষিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়।

পূর্বোক্ত আলোচনার পটভূমিতে একথা বলা চলে যে, কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত জোট সরকার দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং মানবাধিকারের সামনে এক বড় বিপদ। এর মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এক চরম দক্ষিণপন্থার বিপদ সমুপস্থিত। বামপন্থী ও সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির গণতান্ত্রিক জোটই পারে এই মহা-বিপদ থেকে দেশকে উদ্ধার করতে এবং তীব্র শ্রেণী ও গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব।□

৬ দফা দাবি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চাকরি সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েত ও বোর্ড-কর্পোরেশনের কর্মচারীদের ডব্লু বি এইচ এস-২০০৮-এর আওতাভুক্ত করতে হবে। এই স্তরের কর্মচারীদের ই এস আই-তে অন্তর্ভুক্তি চলবে না।

- শিক্ষার মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে সমাজবিরোধীদের হামলা ও আক্রমণ বন্ধ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সর্বত্র সুনিশ্চিত করতে হবে।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

যৌথ কনভেনশন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। রাজ্য সরকার পোষিত সবক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষকগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, এই যৌথ মঞ্চে মানুষ গড়ার কারিগররা যেমন আছেন, তেমনই সমাজ পরিবর্তনের ড্রাইভাররাও রয়েছেন। আবার শ্রমিক আন্দোলনে বাইরে থেকে

রাজনীতিগত ও মেধাগত উপাদান যুক্ত করার লোকজনও রয়েছেন। এই বৃহৎ ঘুমন্ত শক্তি আজ জেগে উঠেছে। পরিস্থিতির চাহিদাতেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং রাজ্যেও দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। এই সংগঠনে আই এন টি ইউ সি, বি এম এসও যুক্ত হয়েছে সামগ্রিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করবে এই যৌথ মঞ্চের সংগ্রাম।

রাজ্য পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদ্বোধক বলেন,

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় হারে সামান্য পিছিয়ে থাকলেও বছরে দু'বার মহার্ঘভাতা কর্মচারীরা পেয়ে এসেছেন বরাবর। এটা বামফ্রন্ট সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী দরদী মনোভাবেরই প্রতিফলন ছিল। নতুন সরকারের মনোভাব দমনপীড়ন মূলক। নতুন সরকারের শ্রমমন্ত্রী এসেই ঘোষণা করলেন যে সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নেই। ট্রেড ইউনিয়নের 'অ আ ক খ' জানলে এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য রাখতে পারতেন না। মহার্ঘভাতা চাইলে বিগত সরকারের ৩৪ বছরের দেনার প্রসঙ্গকে যারা অজুহাত হিসাবে খাড়া করে; তারা বিগত তিন বছরে একশো কোটি টাকা দেনা করে বসে আছে। অপচয় করে যাচ্ছে জনগণের অর্থের। ক্লাবগুলিকে অনুদান, একই শিল্পীকে একাধিকবার পুরস্কারের নামে অনুদান, মদ খেয়ে মারা গেলেও অনুদান—ইত্যাদির মধ্য দিয়ে হরিরলুঠের মতো কোটি কোটি টাকা বিলানো হচ্ছে। মন্ত্রীদের বেতনভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে উল্টোদিকে কর্মচারীরা মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন না, কৃষক আত্মহত্যা করছেন, চা-বাগানের শ্রমিক অনাহারে মারা যাচ্ছে, পরিবহন দপ্তরের কর্মচারী বেতন, পেনশন না পেয়ে আত্মহত্যা করছেন—সরকারের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই।

উদ্বোধক আরও বলেন, রাজ্য সরকার শিল্প আনতে গিয়ে শিল্পপতিদের নিয়ে 'বেঙ্গল লীডস' করেছেন। আসলে 'বেঙ্গল ব্লীডস' হচ্ছে, মানে বাংলার রক্ত ঝড়ছে। তিনি শিল্পক্ষেত্রে নৈরাজ্য, নারীদের উপর নির্যাতন প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, আক্রমণ যত তীব্র হচ্ছে, শ্রমিক-কর্মচারীরা তত ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। সম্প্রতি ট্যাক্সি চালকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেন। চা বাগানে ১১ ও ১২ নভেম্বর দু'দিনের ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে গেছিল উত্তরবঙ্গের ৩টি জেলা। ২৩টি ইউনিয়ন দলমত নির্বিশেষে এই সংগ্রামে সামিল হয়েছিল বলেই এই ধর্মঘটে অভূতপূর্ব সাড়া পরে। ২৬ জুলাই চটকল ধর্মঘটেও ২০টি ট্রেড ইউনিয়ন একজোট হয়ে সাফল্য পেয়েছে।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বাতাবরণ রাজ্যে তৈরি হয়েছে।

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে উদ্বোধক বলেন, বিজেপি সরকার আরও কঠোরভাবে উদারনীতি প্রয়োগ করছে। শ্রম আইনের মারাত্মক নেচিহাটত সংশোধনের প্রয়াস চলছে। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে শ্রমজীবীদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে চাইছে।

এরপর কনভেনশনের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ। তিনি প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে এই যৌথ মঞ্চের আগামী কর্মসূচীগুলি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা রাস্তায় নামছেন রাজ্য সরকারের শ্রমিক কর্মচারী স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। তিনি হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন যে, প্রয়োজনে জনগণকে সাথে নিয়ে আরও তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হবে এই যৌথমঞ্চ। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন তপন ঘোষ (আই এন টি ইউ সি), বিমল জানা (এ আই ইউ টি ইউ সি), দীপক দাশগুপ্ত (সি আই টি ইউ), সমর চক্রবর্তী (এ বি পি টি এ), বাদল কর (কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) এবং দীপক রায়চৌধুরী (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন)। □

মানস কুমার বড়ুয়া

ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের শপথ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সংশোধন করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। এই সংশোধনীগুলি প্রস্তাবনার পূর্বে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির সাথে কোনরকম আলাপ আলোচনার পথে না গিয়ে সম্পূর্ণ একতরফাভাবে শিল্পপতি বা মালিকের স্বার্থে এই আইনগুলি আনা হয়েছে। শিল্প বিরোধ আইন, কারখানা আইন, ঠিকা শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও রদ) আইন, ন্যূনতম মজুরী আইন, অ্যাপ্রেনটিস আইন সহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগের এলাকা সংকুচিত করে ব্যাপক অংশের শ্রমিকদের আইনের সুরক্ষার বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের কাজের স্থায়ীত্ব, আইনানুগ মজুরী, সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে ● শ্রম আইনের শ্রমিক বিরোধী সংশোধনের বিরুদ্ধে ● ১৫০০০ টাকা ন্যূনতম বেতন ● ঠিকা প্রথার অবসানে স্থায়ীপদে নিয়োগ ● ১০০ দিনের কাজ বন্ধ নয়, কাজের মজুরী ও এলাকা বাড়াতে হবে ● অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা ● আই এল ও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ দুটিতে ভারত সরকারের মান্যতা নিয়ে আবেদনের ৪৫ দিনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন দিতে হবে—এই ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ৫ ডিসেম্বর দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবসের অংশ হিসাবে রানী রাসমনি এভিনিউ-এর সমাবেশে শ্রমজীবী মানুষকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

এই কনভেনশনে প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার 'শ্রমমেব জয়তে' বলে শ্রম আইন সংশোধন করছে। শ্রমযোগী / রাষ্ট্রযোগী / রাষ্ট্র নির্মাতা ইত্যাদি বলে গালভরা শ্লোগান দিচ্ছে অথচ দানবীয় আইন শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে। ইন্সপেক্টর রাজ বন্ধ করে দিচ্ছে। শিল্পপতি হাঙরদের বলা হচ্ছে তুমি নিজেই সার্টিফিকেট দাও যে তুমি মাছ খাও নি। এই রাজ্যের সরকার সরকারি কর্মচারীসহ রাজ্য পাবলিক সেক্টরের কর্মচারী এবং শিক্ষকদের দীর্ঘদিন ন্যায্য পাওনা মহার্ঘভাতা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। সমস্ত নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবেই লড়াইয়ের আহ্বান জানান তিনি।

এছাড়াও কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন আই এন টি ইউসি-র পক্ষে ফারুক আহমেদ, এ আই টি ইউ সি-র পক্ষে রঞ্জিত গুহ, বি এম এস-এর পক্ষে শক্তি পাঠক, এ আই সি সি টি ইউ-র পক্ষে দিবাকর ভট্টাচার্য, এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে দিলীপ ভট্টাচার্য, টি ইউ সি সি-র পক্ষে শৈলেন মণ্ডল, ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস ইউনিয়নের পক্ষে এস কে ব্রহ্ম, ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে অশোক ঘোষ এবং ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক তপন দাশগুপ্ত।

এই কনভেনশনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্মঘট, কয়লা শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট, চা-বাগান ও চটকল শিল্পের শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে পৃথক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। পিয়ারলেস বন্ধ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধেও নেতৃবৃন্দ সরব হন। কনভেনশন পরিচালনা করেন শ্যামল চক্রবর্তী, সমীর ভট্টাচার্য, তপন ঘোষ, দিবাকর ভট্টাচার্য, তাপস ভট্টাচার্য, প্রবীর ব্যানার্জী, শক্তি পাঠক, বরেন বসু এবং দীপক দে-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

সভায় সর্বসম্মতভাবে উত্থাপিত প্রস্তাব সমূহ অনুমোদিত হয়। শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ এই কনভেনশন ঘোষণা করে শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে জানে। তার জন্য তীব্র আন্দোলনের পথে যেতে বদ্ধপরিকর দেশের শ্রমজীবী মানুষ। আগামী ৫ ডিসেম্বর দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে তারই একপ্রস্থ বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। লাগাতার সংগ্রাম আন্দোলন জারি থাকবে। □

সুব্রত কুমার গুহ

দেশজুড়ে সফল ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

১২ই নভেম্বর বুধবার ২০১৪ কর্পোরেট তোষণ ও বেসরকারীকরণের নীতির প্রতিবাদে সারা দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক পরিসেবাকে স্তব্ধ করে দিয়ে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী উভয় অংশের ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণ আবার একবার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি জেহাদ ঘোষণা করল। বিগত ইউ.পি.এ সরকার যে দৃষ্টিভঙ্গিতে চলছিল—কয়েক মাসের নতুন মোদি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই সেইএকই কর্পোরেট তোষণ ও বেসরকারীকরণের ভাবনাকে কার্যকর করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির সামনে দাঁড়িয়ে বেতন কাঠামোর সংস্কার এবং কোন অবস্থাতেই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া যাবে না—মূলত এই দাবীকে সামনে রেখে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ তাদের কষ্টার্জিত অর্থ আমানত করেন ব্যাঙ্কে। আর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাঙ্ক তাদের অর্থের নিরাপত্তা দেয়। দেশের অর্থনীতির হাঁড়ির খবর রাখা ব্যাঙ্ক কর্মীরা জানাচ্ছেন—দেশের সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যাঙ্কিং ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির আওতায় এনে সরকারের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ৫০ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনতে চাইছে। এর অর্থ ফাটকাবাজদের হাতে দেশের সম্পদ তুলে দেওয়া। এর ফলে আমানতকারী বা গ্রাহকদের সঞ্চিত অর্থের কোনই নিরাপত্তা থাবে না এবং সামগ্রীকভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

১২ই নভেম্বরের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল এই শিল্পে অফিসার ও কর্মচারীদের প্রায় ১০০ শতাংশ প্রতিনিধিত্বকারী ৯টি সর্বভারতীয় সংগঠনের যৌথ মঞ্চ ইউ.এফ.বি.আই। ১২ই নভেম্বরের ধর্মঘটে দেশের ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রায় ৭৫০০০ শাখার সমস্ত এবং ১৮টি বেসরকারী ও ৮টি বিদেশী ব্যাঙ্কের ২৫০০০ শাখা বন্ধ ছিল। এমনকি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখাগুলিও এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল। ব্যাঙ্ক কর্মীদের নবম বেতন চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ২০১২ সালের ১লা নভেম্বর। দু'বছর কেটে গেলেও আই.বি.এ—কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত দশম চুক্তির কোন পদক্ষেপ এখনও গ্রহণ করেনি। তাই ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্ক কর্মীরা ২০১৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর এবং ২০১৪ সালের ১০-১১ই ফেব্রুয়ারী দু'দফায় ধর্মঘটে সামিল হলেও কোন সমাধান হয়নি।

ফলে এই অল্প সময়ের ব্যবধানে আবার একটি সর্বাত্মক ধর্মঘটে সামিল হতে বাধ্য করেছে সর্বস্তরের ব্যাঙ্ক কর্মচারীবৃন্দকে। সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের চড়া প্রতিবাদ সহ, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে আউটসোর্সিংয়ের প্রতিবাদ, পি.জে নায়ক কমিটির রিপোর্টের প্রতিবাদ, খান্ডেলওয়াল কমিটির সুপারিশের প্রতিবাদ—এছাড়াও ধর্মঘটের সমর্থনে দাবীগুলির মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে বেতন চুক্তি, নতুন স্থায়ী কর্মী নিয়োগ, সপ্তাহে পাঁচদিন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, কাজের ঘণ্টা নির্ধারণ করা এবং ঋণ খেলাপী কর্পোরেট সংস্থার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও ব্যাঙ্ক শিল্পে আউটসোর্সিং বন্ধ করা। এই সফল ধর্মঘটের পরবর্তী কর্মসূচী হিসেবে তারা আবার ২ থেকে ৫ই ডিসেম্বর ২০১৪ জোন ভিত্তিক রিলে ধমঘটের ডাক দিয়ে রেখেছে।

এটাই আশার দিক যে ব্যাঙ্ক বীমা কয়লা ক্ষেত্র সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিতে যেভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে যে সম্মলিত আন্দোলন গড়ে উঠছে তাকে এক সূত্রে গেঁথে আগামীদিনে বঞ্চনামুক্ত সমাজ গড়ার পথে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে—ধর্মঘটগুলির সাফল্য সেই বার্তাই দিচ্ছে। □

সুগত দাস

চা-বাগান শ্রমিকদের ধর্মঘট

গত ১১ ও ১২ নভেম্বর চা শিল্পের শ্রমিকদের সর্বাত্মক ধর্মঘট সংঘটিত হয়ে গেল। ১১ নভেম্বর উত্তরবঙ্গের ৩টি জেলা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং জেলায় সর্বাত্মক এবং কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলার একাংশে সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে। সাধারণ ধর্মঘটে চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন মানুষেরা অংশগ্রহণ করেছেন। মেহনতি চা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন মধ্যবিত্ত কর্মচারী, শিক্ষক, অসংগঠিত শ্রমিক, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের মানুষ। সাধারণ ধর্মঘটে বন্ধ ছিল অফিস-আদালত, হাট-বাজার, দোকানপাট সহ সমস্ত পরিবহন। যদিও কিছু সরকারী বাস সকালের দিকে যাত্রী ছাড়া ছুটেছে, তবে পরে বেলা বাড়লে সেগুলিও সব উঠে গেছে। ধর্মঘটকে ভাঙতে ব্যবহার করা হয়েছে পুলিশ, র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স প্রভৃতি বাহিনীকে। আমাদের রাজ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির অর্থনীতির ভিত্তি হল চা শিল্প। সেখানে ধর্মঘটের সমর্থন না করে, দলবদল নিয়ে ধর্মঘট বিরোধী মিছিল করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী। যদিও এর বিপরীতে বামপন্থী দলগুলি এবং বামপন্থী গণসংগঠনগুলি ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় ছিলেন এবং এই অপরাধে বেশ কয়েকজন বামপন্থী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। চা শিল্পের শ্রমিকদের ধর্মঘট এই প্রথম নয়, আগেও বিভিন্ন দাবিতে বারে বারে ধর্মঘট হয়েছে। প্রতিটি বাগানের সাথে জড়িয়ে আছে লড়াইয়ের ইতিহাস। পূর্বে বাগানের ম্যানেজারদের দিয়ে ধর্মঘট ভাঙানোর চেষ্টা হত। কিন্তু এবার মালিকপক্ষ ধর্মঘট ভাঙার হিম্মত দেখায়নি, তার জায়গা নিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন। পুলিশ ও প্রশাসনের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে কোনো দোকানের একটি পাল্লা পর্যন্ত খোলেনি।

গত পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তীতে আগস্ট মাসের ১২ তারিখে চা বাগান শ্রমিকদের সমর্থনে উত্তরবঙ্গে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল। তখন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "ধর্মঘট, বন্‌ধের নামে যে যা ইচ্ছা তাই করবে তা মেনে নেব না। কাউকে করতেও দেব না। আইন করে বন্‌ধ, অবরোধ রুখে দেব। এটা আমার প্রতিজ্ঞা। যদিও ধর্মঘট বন্‌ধ তিনি আটকাতে পারেননি। শ্রমজীবীদের লড়াই-আন্দোলনের

ধর্মঘটে বন্ধ ছিল অফিস-আদালত, হাট-বাজার, দোকানপাট সহ সমস্ত পরিবহন। যদিও কিছু সরকারী বাস সকালের দিকে যাত্রী ছাড়া ছুটেছে, তবে পরে বেলা বাড়লে সেগুলিও সব উঠে গেছে। ধর্মঘটকে ভাঙতে ব্যবহার করা হয়েছে পুলিশ, র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স প্রভৃতি বাহিনীকে। আমাদের রাজ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির অর্থনীতির ভিত্তি হল চা শিল্প। সেখানে ধর্মঘটের সমর্থন না করে, দলবদল নিয়ে ধর্মঘট বিরোধী মিছিল করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী। যদিও এর বিপরীতে বামপন্থী দলগুলি এবং বামপন্থী গণসংগঠনগুলি ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় ছিলেন এবং এই অপরাধে বেশ কয়েকজন বামপন্থী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। চা শিল্পের শ্রমিকদের ধর্মঘট এই প্রথম নয়, আগেও বিভিন্ন দাবিতে বারে বারে ধর্মঘট হয়েছে। প্রতিটি বাগানের সাথে জড়িয়ে আছে লড়াইয়ের ইতিহাস। পূর্বে বাগানের ম্যানেজারদের দিয়ে ধর্মঘট ভাঙানোর চেষ্টা হত। কিন্তু এবার মালিকপক্ষ ধর্মঘট ভাঙার হিম্মত দেখায়নি, তার জায়গা নিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন। পুলিশ ও প্রশাসনের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে কোনো দোকানের তোড়ে, বন্‌ধ, অবরোধ রুখে দেওয়ার 'প্রতিজ্ঞা' ভেসে গেছে খড়কুটোর মতো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ন্যূনতম মজুরিসহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে ১১ ও ১২ নভেম্বর ৪৮ ঘণ্টা রাজ্যের চা শিল্পে ধর্মঘট আহ্বান করেছিল শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরাম। রাজ্যের প্রায় সাড়ে চার লক্ষ চা শ্রমিক ও কর্মচারী পরিবার বর্তমানে এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। মাত্র ৯৫ টাকা দৈনিক মজুরিতে চা শ্রমিকদের কাজ করতে হয় প্রতিদিন। এই অবস্থায় রাজ্যের তৃণমূল সরকার চা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি সম্পর্কে চরম উদাসীন। ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ বেতন চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখনও পর্যন্ত সাতটি বৈঠক হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের দিশাহীনতায় বৈঠক থেকে শ্রমিকদের স্বার্থে আইন অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরির দাবি উপেক্ষিত থেকে গেছে। রাজ্য সরকারের উদাসীনতা এমন পর্যায়ে গেছে যে গত ১৩ অক্টোবর গুয়াহাটিতে ভারত সরকারের শ্রম ও বাণিজ্য দপ্তরের সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন না। □

প্রণব কুমার কর

সংগ্রামী হাতিয়ার পঠন-পাঠন ও বণ্টন প্রসঙ্গে কিছু কথা

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

অভ্যন্তরেও নিয়ম নীতির কোন বালাই থাকছে না। অর্থনৈতিক ও অধিকারগত দাবি-দাওয়া সম্পর্কে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন। রাজ্য সরকারী স্তরে কার্যত নিয়োগ বন্ধ। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগের মধ্য দিয়ে বিপুল শূন্যপদজনিত কাজের ঘাটতি কোনপ্রকারে সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যা বিপরীতে বেকারদের চাকরীতে নিয়োগ এবং কর্মরতদের পদোন্নতির অন্তরায় হচ্ছে। বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান এবং পে-কমিশন সম্পর্কে সরকারের কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই এই অবস্থার মোকাবিলা এবং দাবি আদায়ে বৃহত্তর সংগ্রাম-আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও রাজ্য সরকার পোষিত বিভিন্ন সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী

ধারাবাহিক সংগ্রাম গড়ে তোলার এই প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর কর্মচারী সমাজকে সচেতনভাবে সামিল করাতে সংগ্রামী হাতিয়ারকেও গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে তৎপর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সংগ্রামী হাতিয়ার-এর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। কিন্তু সেই সাথে এই প্রশ্নটাও উঠে আসছে যে, পত্রিকায় তো বিষয়বস্তু ছাপালেই হবে না। সেই বিষয়গুলি গ্রাহকদের নিয়মিত পঠন-পাঠন পক্রিয়ার অংশ হচ্ছে কি না? এক্ষেত্রে সংগঠনের সংশ্লিষ্টস্তরগুলি সজাগ, সতর্ক এবং পরিকল্পনা নির্দিষ্ট করে ভূমিকা পালন করছে কি না? রাজ্যের কয়েকটি মহকুমা/ব্লকে সাংগঠনিক উদ্যোগে পাঠচক্র চলছে। এ উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু তার সংখ্যা বাড়ছে না কেন? অন্যান্য মহকুমা-ব্লকে তার বিস্তার ঘটাতো খুবই প্রয়োজন। বিশেষত বর্তমান জটিল আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। তাছাড় পত্রিকার গ্রাহক বন্ধুদের পাঠাগ্রাহী করে তোলার প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে সময়মতো তাঁর হাতে পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া। যারা নিয়মিত পত্রিকা পাঠ করেন— তাঁরাও সময়মতো পত্রিকা না পেলে হতাশ হন। পত্রিকা গ্রাহকদের হাতে সময়মতো পৌঁছে দেওয়াও কিন্তু আমাদের সাংগঠনিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে পরে। যে মুহূর্তে আমি কাউকে গ্রাহক করছি সেমুহূর্ত থেকে আমি স্বেচ্ছায় এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হচ্ছি। কিন্তু আমাদের পত্রিকা বিলি বণ্টনের চিত্রে তার প্রতিফলন ঘটছে না। প্রায়শই এই অনুযোগ শোনা যায়— পত্রিকা দপ্তরে পরে থাকছে দীর্ঘদিন। বিলিবণ্টন হচ্ছে না। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিগত সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনে এই প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছিল, তা এর একবার স্মরণ করা যেতে পারে— "প্রথমত গ্রাহকভুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই সংগঠনের ওপর দায়বদ্ধতা বর্তায় গ্রাহকের কাছে যথাসময়ে পত্রিকা পৌঁছে দেওয়ার। দুঃখের হলেও সত্যি বহু ক্ষেত্রেই গ্রাহকের কাছে পত্রিকা পৌঁছায় বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা লঘু হয়ে যাওয়ার পর। এই অসাংগঠনিক প্রবণতার কাছে পত্রিকা প্রকাশনার শ্রম-নিষ্ঠা ও সংগঠনের বিপুল পরিমাণ আর্থিক দায়ভার বহনের আন্তরিকতা গৌণ হিসাবেই বিবেচিত হচ্ছে। সাংগঠনিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংগঠনিক ঐতিহ্যের সাথে এই বিষয়গুলি আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।" (পৃঃ ৫৭)

রাজ্য সম্মেলনের এই নির্দেশ কার্যকরী করতে আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে। আজকের দিনে মূলস্রোতে গণমাধ্যমগুলি বিভিন্নভাবে যখন কর্মচারী সমাজসহ সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করছে বা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত করছে, তখন আমাদের প্রচারমাধ্যমকে সঠিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে ব্যবহার করতে পারার গুরুত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজন।□

পরমেশ দে

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
43rd Year 7th Issue, November 2014

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

সংগ্রামী হাতিয়ার পঠন-পাঠন ও বণ্টন প্রসঙ্গে কিছু কথা

ট্রেড ইউনিয়ন মুখপত্রগুলির মধ্যে বিষয়বস্তু, আঙ্গিক এবং প্রচার সংখ্যা—সমস্ত দিক থেকেই সংগ্রামী হাতিয়ার নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। দীর্ঘকালীন সেই ঐতিহ্যের গরিমাকে অক্ষুন্ন রেখে সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে পরিস্থিতির চাহিদা মিটিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের চমৎকার বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। সেই বোঝাপড়া? প্রথমত, পত্রিকা সজাগ-সতর্ক বিশাল সংখ্যক গ্রাহকের চাহিদা সম্পর্কে। অধ্যয়ন অনুরাগী পাঠক বাহিনী যাতে কোনভাবেই বঞ্চিত না হয়। দ্বিতীয়ত, একেবারে স্বল্পমূল্যে গ্রাহকের হাতে পত্রিকাকে তুলে দিতে কেন্দ্রীয় ফাণ্ড থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি বাবদ পত্রিকা পেয়ে থাকে তার মর্যাদা রক্ষা এবং ঘাটতি পূরণে পৃষ্ঠাসংখ্যার বিন্যাসসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় সংকোচনের আন্তরিক প্রয়াস, বিষয়বস্তুকে বিন্দুমাত্র লঘু না করেই। তৃতীয়ত, বিষয় বৈচিত্র্যে পাঠকের চাহিদাপূরণে যথাসম্ভব আন্তরিক এবং শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তাছাড়া দৈনিক সংগ্রাম-আন্দোলনের চলমান ঘটনাবলী এবং তার প্রেক্ষিত, জেলায়-জেলায় সংগঠন সমূহের আহ্বানে রক্তদান, মিলন-মেলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের খবরাখবর ধারণ ও প্রচারের কাজটাও সেই সঙ্গে থেকে যায়। কারণ পত্রিকা একাধারে প্রচারক ও সংগঠকও বটে।

বিপুল পাঠক সমাজের কাছে নিরন্তর অসংখ্য কী এবং কেন-র চাহিদা নিরসনের দায়িত্ব থাকে। দুর্বার ক্ষমতাশালী কর্পোরেট পুঁজি পরিচালিত সংবাদ মাধ্যমগুলি প্রতিনিয়ত

নানা বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারে শাসকশ্রেণী বিরোধী সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ লড়াকু মানুষের চিন্তার জগতে নৈরাজ্য ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে চলে। এর বিরুদ্ধে সীমিত ক্ষমতা স্বত্ত্বেও সংগ্রামী হাতিয়ার অসম যুদ্ধে লিপ্ত নিরলস এক যোদ্ধা। চিন্তা, চেতনার তাত্ত্বিক ভিত্তিকে দুর্বল করার মিডিয়া প্রয়াসের মুখোমুখি আমাদের প্রিয় মুখপত্র কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। এছাড়া উপায়ই বা কি? কেননা দেশ এখন এক চরম সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে।

চরম প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতির মতাদর্শবাহী একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন হয়েছে। 'আচ্ছে দিন আসার' প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী এই সরকারের ক্রিয়াকলাপে ইতিমধ্যেই আপামর মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে।

এ রাজ্যেও চলছে এক নৈরাজ্যের সরকার। প্রশাসনে দলতন্ত্র কায়েম হয়েছে আটোসাঁটো ভাবে। খুন, সন্ত্রাস, মহিলাদের সম্ভ্রমহানি, তোলাবাজি সমস্ত ঘটনাতেই প্রশাসনের ভূমিকা পক্ষতামূলক। মানবাধিকার পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে। গণতন্ত্রের নামে চলছে স্বেচ্ছাচারিতা, রাজ্য প্রশাসনের

(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

ত্রিপুরায় রাজ্য কর্মচারীদের সম্মেলন

ত্রিপুরা সরকারী গ্রুপ-ডি কর্মচারী সমিতি, ৫২তম বর্ষে— ২৩তম রাজ্য সম্মেলন ১৪ থেকে ১৬ নভেম্বর ২০১৪ আগরতলার টাউন হলে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সংগ্রামী মেজাজ নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ নভেম্বর দুপুর ১টায় সমিতির রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রেত প্রদান করেন সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান তথা লোকসভার সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত, সুমিত ভট্টাচার্য, প্রশান্ত সাহা, সমিতির বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক আবদুল মতলিব, সি আই টি ইউ-র সহ সভাপতি পাঞ্চালী ভট্টাচার্য। ফুলের মালা ও পুস্পস্তবক অর্পণ করেন সমিতির কর্মকর্তাগণ, ১৬টি বিভাগ, ১৩টি অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে। ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড) সহ বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের পক্ষ থেকেও পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন বিশু চক্রবর্তী, অঞ্জু দেবনাথ, রীণা চক্রবর্তী, শ্যাম বাহাদুর দেববর্মা, বেণুলাল দেবনাথ, দেবদাস দে, নিরঞ্জন রায়। পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন আব্দুল মতলিব, খোকন পাল, অজিত ভট্টাচার্য, হারাধন বৈদ্য, মনোয়ারা বেগম, অজয় ভট্টাচার্য, বাবুল দেবনাথ।

প্রস্তুতি কমিটির পক্ষে চেয়ারম্যান তথা লোকসভার সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত স্বাগত ভাষণ রাখেন। উদ্বোধনী গণ সংগীত পরিবেশন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংস্কৃতিক শাখার শিল্পীবৃন্দ, সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন রাজ্যের কৃষি, প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মা মহাশয়, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন আব্দুল মতলিব, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন বাবুল দেবনাথ, প্রতিবেদনের উপর ৩১ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ৭৫১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত

সম্মেলনে প্রধান অতিথি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার

ছিলেন। এস সি ১৩৯ জন, এস টি ৬ জন, ও বি সি ১১৯ জন, মহিলা ১৫১ জন, মাইনরিটি ২৯ জন। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সরকার। ভ্রাতৃপ্রতীম বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সংহতিমূলক বক্তব্য রাখা হয়। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি সরকারী কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সাহা। প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। সম্মেলনে অধিকারগত ৩৭ দফা, সার্বিক ৯ দফা মোট ৪৬ দফা দাবি সনদ সহ ১০টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৪ নভেম্বর ২০১৪ বিকাল ৫টায় স্থানীয় টাউন হলে প্রাঙ্গন ২৩তম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন সুমিত ভট্টাচার্য, সম্পাদক, সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকা। বিশেষ বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এই বি রোড) সাধারণ সম্পাদক অসীম পাল, প্রকাশ্য সমাবেশের বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন আব্দুল মতলিব।

সর্বশেষ সম্মেলনে সর্ব সম্মতিক্রমে ২১৫ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি, ৬৫ জনের কার্যকরি কমিটি ও ২৫ জনকে নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীর নির্বাচিত করা হয়। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধক্ষ্য নির্বাচিত হন যথাক্রমে বিশু চক্রবর্তী, খোকনচন্দ্র পাল ও বাবুল দেবনাথ। যে দু'জনকে নিয়ে উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করা হয়, তাঁরা হলেন আব্দুল মতলিব, অজিত ভট্টাচার্য।

সম্পাদকমণ্ডলী ও কর্মকর্তাদের নাম— বিশুচক্রবর্তী (সভাপতি), অঞ্জু দেবনাথ (সহ সভাপতি), সন্তোষ দেবনাথ (সহ সভাপতি), মনোয়ারা বেগম (সহ সভাপতি), খোকন পাল (সাধারণ সম্পাদক), হারাধন বৈদ্য (অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক), শ্যামবাহাদুর দোটা (যুগ্ম সম্পাদক), জয়নালউদ্দিন (যুগ্ম সম্পাদক), বিবেকানন্দ রায় (যুগ্ম সম্পাদক), মদনমোহন দেব (যুগ্ম সম্পাদক), বাবুল দেবনাথ (কোষাধ্যক্ষ), নিরঞ্জন রায় (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), বাবুলকৃষ্ণ পাল (অফিস সম্পাদক), শিখা চক্রবর্তী (অফিস সম্পাদিকা), নির্মল সরকার (প্রচার সম্পাদক), অনিক মজুমদার (প্রচার সম্পাদক), নির্মল বর্মণ (সংগঠন সম্পাদক), রিনা চক্রবর্তী (সংগঠন সম্পাদক), জয়নালউদ্দিন (সংগঠন সম্পাদক), অমন্য দাস (সংগঠন সম্পাদক), নারায়ণ সরকার (সংগঠন সম্পাদক), গৌতম রায় (সংগঠন সম্পাদক), সুজিত পাল (সংগঠন সম্পাদক), নারাণ দে (সংগঠন সম্পাদক)। □

বনগাঁয় সংগ্রামী হাতিয়ারের ১১০০তম পাঠচক্র

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনর্গা মহকুমা শাখার উদ্যোগে গত ২৫ নভেম্বর ২০১৪ সংগ্রামী হাতিয়ারের ১১শতম পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে এই ধরনের পাঠচক্রের আয়োজন করে আসছে মহকুমা কমিটি।

এদিনের সভার শুরুতেই গণসঙ্গীত পরিবেশ করেন বনগাঁ মহকুমা শাখার সাংস্কৃতিক উপসমিতি। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রতিমা হালদার। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন শিক্ষা উপসমিতির আহ্বায়ক অনিরুদ্ধ স্যানাল। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে— গৌতম গাঙ্গুলী, সম্পাদক বনগাঁ মহকুমা শাখা এবং জেলার যুগ্ম সম্পাদক বিপ্লব রায়। সভায় উপস্থিত পাঠকদের মধ্যে থেকে আলোচনায় অংশ নেন তপন

১১০০তম পাঠচক্রের একাংশ

আইচ, আলপনা বিশ্বাস, মলয় রায় এবং সুপ্রিয় চক্রবর্তী। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। তিনি এই ধরনের ধারাবাহিক উদ্যোগের জন্য বনগাঁ মহকুমা কমিটি এবং পত্রিকার পাঠকবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। একইসাথে আশা প্রকাশ করেন যে, বনগাঁ মহকুমা কমিটির এই প্রচেষ্টা রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তেও সমধর্মী কর্মসুচি গ্রহণে সংগঠকদের উৎসাহিত করবে। এছাড়াও পত্রিকায় পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করবে। সভায় ১২০ জনেরও বেশি পাঠক উপস্থিত ছিলেন। □

চটকল শিল্পে সর্বাত্মক ধর্মঘট

রুগ্ন চটকল শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও ন্যায্য পাওনার দাবিতে গত ২৬ নভেম্বর ২০১৪, ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন চটকল শ্রমিকেরা। ঐদিন সমস্ত চটকল বন্ধ হকার পাশাপাশি মিছিল। সমাবেশ ও প্রতিবাদ ধর্মী বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করলেন চটকল শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিক কর্মচারীরা। চটশিল্পের শ্রমিকদের ২০টি সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। অথচ ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য একমাত্র মীরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন। যদিও তাদের সেই প্রচেষ্টা ধর্মঘটী শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়।

প্রসঙ্গত, রুগ্ন চটশিল্পগুলি পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকীকরণের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষা করছে সরকার ও মালিকপক্ষ।

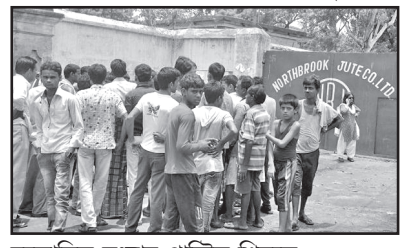

বহুজাতিক সংস্থার প্লাস্টিক শিল্পকে বাজার করে দেবার স্বার্থেই এই কাজ করা হচ্ছে। শ্রমিকদের মাসিক ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা বেতনের দাবি, মহার্ঘভাতা সহ চিকিৎসার কিছু সুযোগ-সুবিধা বা অবসরকালীনভাতার সম্পর্কেও মালিকপক্ষ ও সরকার নীরব। চুক্তিভিত্তিক নিযুক্ত শ্রমিকদের স্থায়ীকরণের দাবিও উপেক্ষিত হচ্ছে।

ঐদিন উপরোক্ত দাবিগুলিকে সামনে রেখে সর্বাত্মক ধর্মঘটের পাশাপাশি, কলকাতার রাণী রাসমণি এভিনিউতে এক বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল হন চটশিল্পের শ্রমিকরা। সেখানে সিআইটিইউ অনুমোদিত বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন সহ ধর্মঘটী ২০টি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।